International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-II, Issue-XI, December 2016, Page No. 01-21
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

‘দেশভাগ’-এর পটভূমি: বাংলা কবিতা ও কথাসাহিত্যে

ড. অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নহাটা যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, নহাটা, উত্তর চব্বিশ পরগণা, ভারত

Abstract

As per opinion of modern researchers the story behind the partition of Bengal was massively political. The innocent Hindoo and Muslim of our country were grossly gravitated by the immoral objectives of some political leaders and communal provocations has made the ultimate blunder for our nation. The partion took place after independence in 1948 and after Bangladesh war in 1971 was not only the destruction of lives and resources from both part of Bengal but also a hard stroke against civilization, culture as well as our humanity. Partition literature from both part of Bengal in different time raised its voice based on some common interests like language, fraternity and human rights. Bengalee writers of East Bengal have perceived the maximum oppression of partition rather than the writers of West Bengal. From Tarasankarsankar Bandyopadhyay, Narayan Gangopadhyay, Samaresh Basu and others to Amar Mitra, Sayed Waliullah, Akhtaruzzaman Elius, Hasan Azizul Haque—every one showed the impact of partition differently in their writings. Reality, Experiences, Trama, Dreams and Memories related to the partition has been depicted in those novel and short stories in various wings. Cognition to next generation was also being recorded in this sphere.

প্রকৃত অর্থে ধর্ম ও তার আদর্শ এবং রাজনীতি এ দুটির আপাত মিলনও কখনও কোনো উন্নয়নশীল দেশ অথবা রাষ্ট্রের পক্ষে হিতকর নয়। এর প্রমাণ ইতিহাস। কারণ এরা স্বভাবে, গোত্রে এবং রীতিতে সম্পূর্ণতঃই একে অন্যের বিপরীত। একটির মধ্যে আদর্শের সম্ভাবনা যতটাই প্রকট অন্যটির মধ্যে অনাদর্শের সম্ভাবনা ততটাই প্রচ্ছন্ন। কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা দ্বিজাতিতত্ত্বের অবশ্যাম্ভাবী ফল হিসাবে ‘দেশভাগ’ যেমন শুধু দেশ নয়, আমাদের মানবত্বকেই দ্বিখণ্ডিত অথবা বহুখণ্ডিত করেছে, তেমনি আজকের যুগে বসেও তথাকথিত ‘তিন-তালাক বিতর্ক’ অবিরত সেই রাজনৈতিক অনুপ্রবেশের আশংকাকেই প্রকটিত করে চলেছে। এছাড়া কিছু হিন্দুত্বের ধ্বজাধারীও আছেন যারা ধর্মের নামে সংস্কৃতি ও ধর্মের মধ্যে জগদ্দল পাথরের মতো রাজনীতিকে বসাতে চান। এছাড়া আছেন কিছু গোঁড়া মোল্লা, মৌলবী আর সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী যারা যতটা না ইসলামের উদারতা ও সহনশীলতায় বিশ্বাসী তার থেকে অনেক বেশী বিশ্বাসী জিহাদে ও সন্ত্রাসে। প্রকারান্তরে তাদের এই জেহাদের পেছনেও আছে সংকীর্ণ মৌলবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে ওঠা সেই সংকীর্ণ ধর্মীয় রাজনীতি, যা পরধর্মের প্রতি হিংসাশ্রয়ী আচরণ ও ক্ষুরধার বিভেদকেই প্রাধান্য দেয়।

বাংলা সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমান দুটি জাতির পারস্পরিক সহাবস্থান সমরূপে চিহ্নিত হলেও বাংলার সমাজ ও রাজনীতি কিন্তু কখনই তেমনটি ছিলনা। ঔপনিবেশিক ইংরেজ আমল থেকেই ইংরেজ-পদানত এ দুটি জাতি কখনও প্ররোচনাবশতঃ বা কখনও স্বার্থবুদ্ধি প্রয়াসে পরস্পরের সঙ্গে তীব্র দ্বন্দ্বে মত্ত হয়েছে। প্রত্যক্ষ রাজনীতিক হিসাবে ইংরেজ স্বার্থবুদ্ধি সেখানে প্রবল হলেও পক্ষপাতগ্রস্ত কোনো একটি জাতি এক এক সময়ে অন্য জাতির প্রতি রাজনৈতিক ভাবে বিদ্বিষ্ট আচরণেরই পরিচয় দিয়েছে। ভারতের ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসনের দুশো বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস অন্ততঃ সেই সাক্ষ্যই দেয়। এ যাবৎ অনেক আলোচক ও সমালোচক নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিচারের প্রয়াস করেছেন। সে বিতর্কে না গিয়েও রাজনীতি ও ধর্মীয় আদর্শের এই অশুভ টানাপোড়েনের মূলান্বেষণে কয়েকটি কথা উঠে আসে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দীর্ঘ শাসন কালে (১৭৭২-১৮৫৭) ও তারপর ইংরাজের প্রত্যক্ষত শাসনতান্ত্রিক সাম্রাজ্য কালে (১৮৫৭-১৯৪৭) স্থানীয় ধর্ম-বিরোধ, বিশেষ করে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধকে ইংরেজরা বারেবারেই তাদের নিজেদের প্রয়োজনমতো শাসনক্ষমতার স্থায়িত্বের কাজে ব্যবহার করে গেছে। আর এ দ্বান্দ্বিক তুলার মধ্যবর্তী সূচক কাঁটাটিও ছিল 'ধর্ম'। মনে রাখতে হবে, ইংরাজ জাতিরও একটি নিজস্ব ধর্ম ছিল এবং তা ছিল খ্রীষ্ট ধর্ম অথবা খ্রীষ্টান ধর্ম। কিন্তু, তখনকার সামাজিক পরিকাঠামো এখনকার মতো কসমোপলিটান ছিল না বরং ইংরেজ আগমনের পূর্ব থেকেই দীর্ঘ মুসলমান শাসনের দৌলতে ভারতীয় ধর্ম ও সমাজ খ্রীষ্টানী বিষয়ের তুলনায় ইসলামী বিষয়ের উপরেই গুরুত্ব দিয়েছিল অনেক বেশী। মধ্যযুগের সাহিত্যেও অনেকাংশে তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ভারতীয় ইতিহাস ও রাজনীতিতে তুর্কি-পাঠান-আফগান-মোগল শাসকেরা যেভাবে জনসাধারণের কাছে 'মুসলমান শাসক' বলে পরিচিত হয়েছিলেন; ইংরেজ শাসকেরা কিন্তু কখনই সেভাবে 'খ্রীস্টান শাসক' বলে পরিচিত হননি। কিন্তু ইংরেজ শাসকের এই পরিচিতির মূল্য তাকে অসাম্প্রদায়িক তো করেইনি বরং তা প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত পুরোদমে হিন্দু-মুসলিম বিরোধকে কাজে লাগিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে বিভ্রান্ত ও ব্যাহত করার চেষ্টা করে গেছে এবং ইতিহাসের বিচারে তা ভারতবর্ষের দীর্ঘ মুসলিম শাসনামলের সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকেও ছাড়িয়ে গেছে। এসবই ধর্ম ও রাজনীতির অশুভ আঁতাতেরই বিষময় ফল ছাড়া আর কিছুই নয়।

২রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ জাপানের আত্মসমপর্ণের সাথে সাথেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে। যুদ্ধোত্তর ব্রিটেনে তখন শ্রমিক দলের সরকার ক্ষমতাসীন ছিল। ক্লিমেন্ট এটলি সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। যুদ্ধ বিধ্বস্ত ব্রিটেন সরকার ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে উদগ্রীব হয়ে পড়ে। সে জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট 'ব্রিটিশ ক্যাবিনেট' মিশন ভারতে পাঠানো হয়। সেই তিন সদস্যরা ছিলেন যথাক্রমে লর্ড পেথ্রিক লরেন্স, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ ও মিঃ এ. ডি. আলেক্সজান্ডার। ক্যাবিনেট মিশনের পক্ষ থেকে ১৬ই মে ১৯৪৬ এক ঘোষণায় জানানো হয় যে, পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে মুসলিম লীগের দাবী অনুযায়ী 'পাকিস্তান' সৃষ্টি করলেই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হবে না। সেকথা মাথায় রেখে 'ক্যাবিনেট' মিশন ভারতের অখণ্ডতা বজায় রেখেই ক্ষমতা হস্তান্তরের এক পরিকল্পনা তৈরী করে। সেটিই ইতিহাস খ্যাত 'ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান'। তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদ ছিলেন তার রূপকার। প্ল্যানের এক নম্বর সুপারিশ ছিল ব্রিটিশ ভারত ও করদ রাজ্যগুলো নিয়ে একটিই ভারত ইউনিয়ন গঠিত হবে। প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ এই তিনটি দপ্তরই শুধু ইউনিয়ন সরকারের হাতে থাকবে। উক্ত তিনটি বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের ক্ষমতাও ইউনিয়ন সরকারের হাতেই থাকবে। বর্ণিত তিনটি বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয় তথা উদ্বৃত্ত ক্ষমতা থাকবে প্রদেশ সমূহের। প্রদেশগুলো এ, বি, ও সি এই তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে নিজ নিজ সংবিধান তৈরী করবে। প্রস্তাবিত তিনটি গ্রুপের 'এ' গ্রুপ ছিল অমুসলিম প্রধান প্রদেশগুলো নিয়ে। 'বি' গ্রুপ ছিল মুসলিম প্রধান প্রদেশগুলো নিয়ে। বাংলা ও আসাম নিয়ে ছিল 'সি' গ্রুপ। ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানে ইউনিয়ন স্তরে পাকিস্তান দাবী আগ্রাহ্য হলেও প্রদেশ স্তরে মুসলিম লীগের দাবী অনেকটাই মানা হয়ে যায়। যে কয়টি প্রদেশ নিয়ে মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবী করছিল ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানে আসাম সহ

তার সব কয়টিই দুটি গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত হয় (গ্রুপ 'বি' ও গ্রুপ 'সি')। ওই সব প্রদেশের স্বতন্ত্র সংবিধান তথা শাসন ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার বিষয়টা সুস্পষ্ট অবস্থায় আসাতে মুসলিম লীগও ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান গ্রহণ করে।

ভারতীয় রাজনীতিতে একসময় মুসলিম লীগ স্বতন্ত্র পাকিস্তানের দাবী থেকে সরে আসায় দেশব্যাপী স্বস্তির বাতাবরণ তৈরী হয়েছিল। সেই বাতাবরণে ভারত স্বাধীন হলে আজ আমরা সত্যই এক অখণ্ড ও বৃহত্তর ভারতবর্ষ পেতাম। কিন্তু সেই স্বস্তির আভাস ছিল বিজলীর ক্ষণিক চমকের মতো ক্ষণস্থায়ী। ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখা যায় ইংরেজের তৈরী 'ক্যাবিনেট মিশন' স্থাপিত হবার পর ভারতীয় স্টেটের গ্রুপ 'সি'তে বাংলা ও আসামকে যুক্ত করার প্রয়াস শুরু হয়। কিন্তু গ্রুপ 'সি'তে বাংলা ও আসাম যুক্ত হলে মুসলিম জনসংখ্যা সামান্য বেশী হয়ে যেত। হিন্দু গরিষ্ঠ আসামের কংগ্রেস নেতৃত্ব ওই রকম গ্রুপিং-এ অন্তর্ভুক্ত হয়ে সংখ্যালঘু হতে রাজী ছিলেন না। এ বিষয়ে জাতীয় কংগ্রেসের ব্যাখ্যা ছিল প্রদেশগুলো ইচ্ছে করলে গ্রুপিং থেকে বের হয়ে যেতে পারে। কিন্তু মুসলিম লীগের ব্যাখ্যা ছিল ঠিক তার বিপরীত। মুসলিম লীগের মত ছিল একবার গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত হলে আর বের হওয়া যাবে না। এ বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের অভিমত মুসলিম লীগের পক্ষেই যায়। এই টানাপোড়েনের ফলে শেষ পর্যন্ত 'ক্যাবিনেট মিশন' প্ল্যান পরিত্যক্ত হয়। পরবর্তী ইতিহাস ক্ষমতা হস্তান্তরের অনিয়ন্ত্রিত ও বেপরোয়া ক্ষিপ্রগতির এক কালিমালিপ্ত অধ্যায়। 'ক্যাবিনেট মিশন' প্ল্যান ব্যর্থ হলে ব্রিটিশ সরকারও নিঃসন্দেহ হয়ে যায় ভারত বিভাগ আর এড়ানো যাবে না। পরবর্তী ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন। ভারতে আসার আগেই মাউন্টব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার জন্য লন্ডনের ব্রিটিশ সরকারের নিকট আর্জি জানান। ক্লিমেন্ট এটলি সেই মতো ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তার ইঙ্গিতও দেন। সে ইঙ্গিতে স্পষ্ট হয় ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে। মাউন্টব্যাটেন ভারতে আসেন ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে। ভারত ভাগ এড়াতে সে সময় মাউন্টব্যাটেন এক অদ্ভুত প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। সেটি ছিল 'প্ল্যান বলকান', আর তার সারমর্ম ছিল ইউরোপের বলকান দেশগুলোর মতো ক্ষমতা হস্তান্তর করা। মাউন্টব্যাটেনের পূর্বসূরী লর্ড ওয়াভেলও 'অপারেশন ব্রেকডাউন' নামে এরকম একটি পরিকল্পনা করেছিলেন। তাতে ভারতকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করে সে সব অঞ্চলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার কথা ছিল। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় দল দ্বারাই ওই অবাস্তব পরিকল্পনা দুটি বাতিল করা হয়। প্রকৃতপক্ষে 'অপারেশন ব্রেকডাউন' ও 'প্ল্যান বলকান' দুটিই ছিল ভারতকে বহুখণ্ডে ভাগ করারই এক সুচিন্তিত কূট পরিকল্পনা। ব্রিটিশ সরকার আন্তরিকভাবেই ভারত বিভাগ চায় না এরকম একটা ভনিতাকে তুলে ধরার প্রয়োজনেই ওই পদক্ষেপ দুটি নেওয়া হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের সেই প্রকৃত অভিপ্রায়কে ফলতি রূপ দিতে মাউন্টব্যাটেন এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করেন। মাউন্টব্যাটেন জানতেন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের সাথে মুসলিম লীগ সুপ্রিমো জিন্নার যে সুদীর্ঘ টানাপোড়েন চলছে তাতে উভয় নেতৃত্বই ভারত বিভাজন নিয়ে ক্রমশঃ বিরক্ত হয়ে পড়ছেন। তাঁদের ধৈর্যচ্যুতিও ক্রমশই বাড়ছে। এসব লক্ষ্য করেই চতুর মাউন্টব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া প্রায় দশ মাস এগিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট করার কৌশল নেন। আর সেটিকে বিশ্বাসযোগ্যতা দিতেই মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেস নেতৃত্বের সামনে একটি 'টোপ' রাখেন। সেটি ছিল কংগ্রেস যদি কমনওয়েলথে থাকতে প্রথমাবধিই রাজী থাকে তা হলে ক্ষমতা হস্তান্তর দশ মাস আগেই হবে। চরম ধৈর্যচ্যুত কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব এতে রাজী হয়ে যান। মুসলিম লীগের কমনওয়েলথে থাকতে প্রথমাবধিই কোনো আপত্তি ছিল না। তাছাড়া পাকিস্তান প্রায় হাতের মুঠোয় চলে আসায় জিন্না আর দর কষাকষিতে না যাওয়াই শ্রেয় বলে মনে করেন ও পাকিস্তানবাসী সাধারণ মানুষের একাংশ ও সংখ্যালঘু হিন্দুদের মতামতকে পদদলিত করে 'খন্ডিত ও পোকায় খাওয়া' (জিন্নার ভাষায়) পাকিস্তান প্রাপ্তিতেই রাজী হয়ে যান। জিন্নার রাজী হবার আরেকটি গুরুতর কারণও ছিল। আর কেউ না জানুক জিন্না নিজে জানতেন তাঁর দূরারোগ্য ক্ষয়রোগ হয়েছে আর চিকিৎসকেরা তাঁকে জানিয়েছেন, তিনি বড়ো জোর আর ছয় মাস বাঁচবেন। জিন্না এটাও জানতেন যে, তিনি যদি 'পাকিস্তান' সৃষ্টি করে না যেতে পারেন তা হলে আর স্বপ্নের পাকিস্তান আর কোনোদিনই বাস্তবায়িত হবে না। ভারত উপমহাদেশের শীর্ষ নেতৃত্বের ধৈর্যচ্যুতির এই সুযোগটাকে কাজে লাগাতেই মাউন্টব্যাটেন ঘড়ির কাঁটাটাকে এগিয়ে আনলেন আর

মাউন্টব্যাটেনের কৌশল মাফিকই ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট মধ্য রাতে দেশ বিভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর দুটিই একসাথে সংঘটনের মধ্যে দিয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি স্বাধীন ডমিনিয়নের সৃষ্টি হলো।

অনেক কট্টর রাজনীতিক ও সমাজতাত্ত্বিকই বলে থাকেন যে, চল্লিশ-এর দশকে, অন্তত বাংলায় কংগ্রেস বহুলাংশে পরিচালিত হয়েছিল 'হিন্দু মহাসভা' দ্বারা। বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায় ও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধির মতো অসংখ্য অসাধারণ জনপ্রিয় নেতারাও ছিলেন হিন্দুত্ববাদী। আর এই 'হিন্দু মহাসভা'ই নাকি অবলম্বন করেছিল হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ। অবশ্য বিরোধীরা এই দাবী নস্যাৎ করে বলেন যে, তাঁদের এই হিন্দুত্ববাদের মর্মমূলে ছিল মানবতাবাদ। অন্যদিকে এ মতও বহুল প্রচারিত যে, একইসময় মুসলিম লীগ গ্রহণ করেছিল মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদ। ঘটনা যাই হোক্ না কেন একথা সত্য যে, বাংলায় তথা সমগ্র ভারতে সেদিন জাতীয়তাবাদ স্থানচ্যুত হয়েছিল যে সাম্প্রদায়িকতাবাদ দ্বারা তা হলো হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদ। এই দুই সাম্প্রদায়িকতাবাদ অথবা বোধ সুপ্তভাবে বরাবরই ছিল, ধুরন্ধর ইংরেজ রাজশক্তি ও তার অনুসন্ধানী রাজনৈতিক কূটকৌশল তাকে উসকে দিয়েছিল মাত্র। কিন্তু এই কারণেই ইংরাজ রাজশক্তিকে ভারত বিভাগের জন্য পুরোপুরি দায়ী করা যায় না, কারণ ইংরাজ সরকারও প্রথমদিকে এই দেশ বিভাজন চায়নি। কিন্তু ধীরে ধীরে তারাও এই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির তীব্রতাকে উপলব্ধি করতে পারে। ১৯৪৬-এ কলকাতা, বিহার ও নোয়াখালির বুকে ঘটে যাওয়া বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও ইংরেজদের চোখ খুলে দেয়। বলা যায়, ভারতবর্ষে প্রধানতঃ ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে বিভেদের যে রাজনৈতিক বাতাবরণ আগে থেকেই তৈরী হয়েছিল ইংরাজ সরকার সেটাকেই তাদের রাজনৈতিক সুবিধা ও সুযোগের হাতিয়ার হিসাবে ক্রমশঃ কাজে লাগিয়েছিল মাত্র। আসলে হিন্দু ও মুসলিম এই দুই সাম্প্রদায়িক শক্তির অবাঞ্ছিত বিরোধই ছিল 'দেশভাগ' তথা ১৯৪৭-এর দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতা প্রাপ্তির মূল কারণ।

আজকাল অনেক রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞই বলে থাকেন, ১৯৪৭-এর 'দেশভাগ' আসলে জিন্নাহ্ ও নেহরুর মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতারই এক অবশ্যাম্ভাবী ও অনিবার্য পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল স্বরূপ দ্বিধাবিভক্ত ও স্বাধীন দেশ ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন নেহরু আর জিন্নাহ্ হন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান বা গভর্নর জেনারেল। এর মধ্যে ধর্ম কোনোদিন, কোথাও ছিল না, পুরোটাই ছিল ব্যক্তি ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধিবাহিত রাজনীতির কূটকৌশল। জিন্নাহ্ কখনই ইসলামপন্থি ছিলেন না, তিনি ছিলেন সারা ভারতের মুসলমানদের জাগতিক স্বার্থের পতাকাবাহী এক মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদী। তিনি ভারতের মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের দাবি তুলে তাতে সফল হন। এই তাঁর প্রধান ও একমাত্র সাফল্য। মনে রাখতে হবে, তাঁর এই সাফল্য আপামর ভারতীয় মুসলিম সমাজ অথবা মুসলীম লিগ তাঁকে এনে দেয় নি, এ সাফল্য তাঁকে দিয়েছিল ইংরেজ। ব্রিটিশ সরকারই তাঁকে দ্বিজাতিতত্ত্বের মহান নায়ক করে তুলেছিল। আর শেষপর্যন্ত তাঁর এ সাফল্যের ভাগীদারও ছিলেন তিনি একা নিজে।

'৪৭-এর 'স্বাধীনতা' ও 'দেশভাগ'-এর পরেও তৎকালীন পাকিস্তানবাদী শক্তি পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে খারিজ করে দিয়ে শক্তিশালী কেন্দ্রভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনে তৎপর হয়েছিল এবং সে উদ্দেশ্যে তারা সংবিধানও প্রণয়ন করতে চেয়েছিল। ইসলামের নাম নিয়ে মুসলিম ভাবাবেগকে অবলম্বন করে তারা সবসময় এককেন্দ্রিক পাকিস্তানি জাতীয় সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে চেয়েছে, আজও চায়। সব সময় ইসলামের কথা বলে তারা জনমনে ভারতবিরোধী মুসলিম সম্প্রদায়ভিত্তিক চেতনাকে জাগিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছে। তাদের মধ্যে আদর্শ ধর্মবোধ ছিল না, শুধুই ছিল সম্প্রদায়বোধ। তারা তৎকালীন পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির জন্য একসময় উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছে এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের শর্ত হিসেবে সব সময় ভারত বিদ্বেষ প্রচারে তৎপর থেকেছে। রেডিও পাকিস্তান থেকে প্রতিদিন সকালবেলায় প্রচার করা হয়েছে, ভারত পাকিস্তানের এক নম্বর শত্রু। কিন্তু একথাও সত্য যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদকে রক্ষা করার জন্য তাদের এসব প্রচেষ্টার একটিও কার্যতঃ সফল হয়নি।

সব মিলিয়ে বলা যায়, ১৯৪৭ সালের 'দেশভাগ'-এর বাস্তবতা তৈরি হয়েছিল অনেক আগে থেকেই।Ñ বলা যায়, এ দেশে ইসলাম ধর্মপ্রচারের শুরু থেকেই। ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ম প্রচার, মুসলমান সমাজ গড়ে ওঠা আর হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের গোটা ইতিহাসেই তার পরিচয় আছে। ইংরেজ আমলে এসে মিলন-বিরোধের মধ্যে দিয়ে এই গোটা প্রক্রিয়াটিই ধীরে ধীরে এগিয়েছে নানাবিধ ধর্মসংস্কার, সমাজসংস্কার, আধুনিক শিক্ষার বিস্তার, বাংলা ভাষা সহ নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য সৃষ্টি, জমিদারতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন, সাম্প্রদায়িকতা, জাতীয়তাবাদ ও তার সম্পূরক আন্তর্জাতিকতাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের প্রেরণা, দাঙ্গা, দেশভাগ, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, পূর্ববাংলার বাঙালি জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতাযুদ্ধ, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। 'দেশভাগ' এর কথা উঠলেই আমরা ১৯৪৭-এর ভারত বিভাজনের কথা ভাবি যা সর্বাথেই এক নেতিবাচক অবয়ব নিয়েই আমাদের সামনে হাজির হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, সত্তরের দশকে বা ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানের ছিন্ন হয়ে যাওয়া ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের জন্ম নেওয়ার মাঝে রয়েছে যে অত্যাচার, মৃত্যু ও দাঙ্গার ইতিহাস, তাও 'দেশভাগ'-এর আর এক অধ্যায়। এ অধ্যায় প্রধানতঃ অত্যাচার ও দাঙ্গার ভয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবাংলায় পালিয়ে আসা শরনার্থী বাঙালির জীবনের ইতিহাস যা সমাজ, রাজনীতি ও সাহিত্যের বিচারে আর এক অন্য তাৎপর্য বহন করে।

এখন দেখা যাক্ ধর্ম ও রাজনীতির এই সমান্তরাল অথচ অহি-নকুল সম্পর্কের মাঝে সাহিত্য অথবা সাহিত্যস্রষ্টাদের অবস্থানটি ঠিক কেমন ছিল। ভারতের মুসলমানরা এক দীর্ঘ সমন্বয় প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে একসময় ভারতের হিন্দু সমাজের সাথে একদেহে লীন হয়ে যাবে এমন স্বপ্ন একদিন দেখেছিলেন দীন-ই-ইলাহীর প্রবক্তা ও উদ্ভাবক স্বয়ং মোঘল সম্রাট আকবর। দীন-ই-ইলাহিতে আকবরের মূল লক্ষ্য ছিল, কোনো ধর্মের ওপর হস্তক্ষেপ না করেও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সর্ব ধর্মের উর্ধ্বে একটি মহান রাষ্ট্রধর্মের উদ্ভাবন, তার অবলম্বন ও তাকে যথার্থ অর্থে পরিচালন করা। দারা শিকোও এমনটিই চেয়েছিলেন। যদিও আওরঙ্গজেবের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন রকম। বাংলা সাহিত্যের সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও মনে হয় একসময় এমনটাই বিশ্বাস করতেন। প্রবল রাজনীতিজ্ঞ ও পররাজ্য গ্রাসকারী তুর্কি-মোগল শাসকদের, বিশেষ করে আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বঙ্কিমের ক্ষোভ ছিল ঠিকই, কিন্তু দেশি মুসলমানদের প্রতি বঙ্কিমের মনোভাব ছিল সহমর্মিতাপূর্ণ। পাঠান সুলতানদের শাসনের প্রতিও বঙ্কিম বেশ প্রসন্নচিত্ততার পরিচয়ই দিয়েছিলেন। প্রকাশভঙ্গী আলাদা হলেও 'ভারততীর্থকবিতায় এবং আরও কোনো কোনো রচনায় রবীন্দ্রনাথও গভীর ' আবেগের সাথে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তাঁর মনের এই আকাঙক্ষার কথাটিই মূলতঃ ব্যক্ত করেছেন। এক্ষেত্রে এও মনে রাখতে হবে যে, কার্যত রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধতা ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দেশব্যাপী জোয়ারই স্বার্থবুদ্ধিচালিত কার্জনের বঙ্গভঙ্গ বিভাজনের প্রথম প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল আর সে বাংলাও ছিল হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত বাংলাই।

উনিশ শতকে হিন্দু সমাজের বুকে যখন কলকাতা কেন্দ্রিক রেনেসাঁ শুরু হয়, গ্রামের মুসলমান সমাজে তখন চলছিল ওয়াহাবি ও ফরাজি আন্দোলন। রাজধানী কলকাতার বুকে মুসলমানদের কোনো প্রগতি প্রয়াসের লক্ষণ তখন খুঁজে পাওয়া যায় না। ধর্মাদর্শগত দিক দিয়ে ওয়াহাবি ও ফরাজি আন্দোলন ছিল ইসলাম ধর্মের এক বিশুদ্ধতাবাদী ও পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন। ওয়াহাবি ও ফরাজিরা এসময় বাংলার গ্রামে-গঞ্জে জমিদারদের অত্যাচার থেকে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কৃষকদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। ধর্মাদর্শের দিক থেকে এ দুটি আন্দোলন ছিল হিন্দু-মুসলমানের এক সাম্যবাদী যৌথ আন্দোলন যাতে হিন্দু-মুসলমান কৃষকেরা নির্বিশেষে যোগ দেয়। এরকম আন্দোলন বাংলার বুকে অনেকবার হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালের ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমানরা ওয়াহাবি ও ফরাজি আন্দোলন দুটিকে সার্থক দৃষ্টিতে দেখেননি। তারাও চেয়েছেন হিন্দুদের মতো মুসলমানদের জন্যও কলকাতাকেন্দ্রিক এক স্বতন্ত্র রেনেসাঁস। মুসলিম লীগ তার প্রতিষ্ঠাকালীন ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করেছিল যে, রাজধানী শহরের বাইরে আধুনিক চিন্তা-চেতনা থেকে দূরবর্তী এ দুটি আন্দোলনে লিপ্ত থেকে মুসলমান সমাজ হিন্দু

সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও পিছিয়ে থেকেছে। তাদের এ ভাবনাও রাজনীতির আড়ালে দুষ্ট ধর্মবুদ্ধির প্রশ্রয়কেই স্পষ্ট করে।

ব্রিটিশশাসিত বাংলার রেনেসাঁসেও দেখা যায়, হিন্দু সম্প্রদায় ও মুসলমান সম্প্রদায় একই ইংরাজ শাসনে দীর্ঘদিন বসবাস করা সত্ত্বেও চিন্তা-চেতনা, মন-মনন, জীবনদর্শন ও মানসিকতার দিক দিয়ে দুটি সম্পূর্ণ আলাদা ধারায় বিকশিত হয়েছে। এই দুই ধারার মিলনের, একীভবনের, সমন্বয়ের সব চেষ্টাই ছিল পুঁথিগত, অগভীর। ইংরেজি শিক্ষা ও রেনেসাঁসের সূচনা প্রথমে ঘটে হিন্দু সমাজে, তার প্রায় শতাব্দীকাল পরে মুসলমান সমাজে। নবচেতনার বিকাশ ঘটেছে অন্যায়, অবিচার, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের মোকাবিলা করেই। অথচ আশ্চর্যভাবে একই শাসনব্যবস্থার মধ্যে থেকেও দুই সম্প্রদায়ের মনোজীবনের বিকাশ গড়ে উঠেছে সমান্তরাল দুই ধারায়। সমন্বয়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও সেখানে বাস্তব সমন্বয় ঘটেনি। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, তিলক, গান্ধী, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, বেগম রোকেয়া, এস ওয়াজেদ আলি, আবুল হুসেন, ওদুদ, নজরুল, চিত্তরঞ্জন, ফজলুল হক প্রমুখের শতাব্দী অতিক্রমকারী আত্যন্তিক চেষ্টাও যে হিন্দু-মুসলমানের আত্মিক, দার্শনিক কিংবা আদর্শগত ঐক্যের সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা পারে নি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণও 'দেশভাগ'। বাংলা সাহিত্যে জাতীয় চেতনার বিকাশে হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়বাদী আকাঙ্খার কথা ব্যক্ত হলেও একথা দুঃখজনকভাবেই সত্যি যে, এই সমন্বয়বাদী আকাঙ্খার নিদারুণ ব্যর্থতা ও স্বাতন্ত্র্যবাদী আকাঙ্খার সীমাহীন সাফল্যই সমাজের বাস্তব প্রতিকৃতি রূপে ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতিতে বারংবার স্পষ্টায়িত হয়েছে। আরো বেদনার যা তা হলো--শুধুই ধর্ম নয়, যা যুগযুগান্তরব্যাপী সর্বধর্মকে সমন্বয়কারী শক্তি রূপে সুদৃঢ়ভাবে বেঁধে রাখে সেই 'সংস্কৃতি'-র দিক থেকেও জাতি হিন্দু ও জাতি মুসলমানে বিভক্ত থেকেই যে এ দুটি সম্প্রদায় চিরকাল বিকশিত হয়েছে তারও প্রত্যক্ষ প্রমাণ হলো এই 'দেশভাগ'। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪) বিশ শতকের প্রথমদিকে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সতর্ক করার জন্য বাংলায় ও ইংরেজিতে দুটি পুস্তিকা প্রচার করেছিলেন। তার মধ্যে একটি ছিল বাঙালির মস্তিষ্কের অপব্যবহার বিষয়ক। কিন্তু শুধু বাংলা নয়, স্বাধীনতার পরে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের হিন্দু ও মুসলমানের সংস্কৃতিতে সমন্বয় প্রচেষ্টার চেয়ে স্বাতন্ত্র্যচেতনার উৎসারনকেই আরোও অনেক বেশী প্রবল হতে দেখা যায়।

আমাদের মনে রাখা দরকার, 'দেশভাগ' তো শুধু সিরিল র‍্যাডক্লিফের তৈরি একটি সীমারেখামাত্র নয়, তা ছিন্নমূল মানুষের মনেরও এক দ্বিধাদীর্ণ বিভাজন। কিছুকাল আগে পর্যন্তও লেখ্যাগার বা আর্কাইভ-নির্ভর তথাকথিত তথ্যনিষ্ঠ উচ্চমার্গীয় লেখকবর্গ দেশভাগ-জনিত ব্যথা, বেদনাবোধ এবং সর্বোপরি এর মানবিক ইতিহাস রচনা করতে সক্ষম ছিল না। ইংরেজিতে 'পার্টিশন লিটারেচার' কথাটি চালু আছে। বাংলায় 'দেশভাগের সাহিত্য' বলতে সাধারণভাবে যা বোঝানো হয় তা এতকাল পাঞ্জাব ও বাংলা দুই প্রান্তের বিভাজন ও তজ্জনিত উদ্বাসনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দেশ বিভাজনের ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণের বহু স্তর আছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমাজ-বিশ্লেষণের সঙ্গে সেই সব ঘটনাপ্রবাহ বহুবিধ ব্যাখ্যা ও বয়ানে সংকলিত হয়েছে। মহাফেজখানার দলিল এবং গৌণ উৎসের পর্যাপ্ত তথ্যের পরেও এই সব ব্যাখ্যা ও বয়ানের সুত্রে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, আজও আমাদের হাতে দেশভাগের কোনো প্রত্যক্ষ সামাজিক ইতিহাস নেই। স্মৃতি আর স্তব্ধতার আখ্যানের মাঝেই রয়ে গেছে 'দেশভাগ'-এর প্রকৃত বাস্তব। সুখের কথা, মহাফেজখানার দলিল-দস্তাবেজের বাইরে গিয়ে গল্প-উপন্যাস, কবিতা-নাটক কথা-কাহিনীর সাহিত্যিক প্রয়াস নিয়ে খুব সম্প্রতি এই মানবিক ট্র্যাজেডিকে ধরার প্রয়াস শুরু হয়েছে। দেশভাগের গল্প বলতে গিয়ে খুশবন্ত সিং-এর ঐতিহাসিক উপন্যাস 'A Train to Pakistan' (১৯৫৬) কিংবা কান্তি পাকড়াশির 'The Uprooted' (১৯৭১) মূলতঃ উদ্বাস্তু মানুষের অভিজ্ঞতাকেই বেশী গুরুত্ব দেয়। নব্বইয়ের দশকেও মূলতঃ স্মৃতিকথাকে ভিত্তি করে দেশভাগ ও উদ্বাস্তুদের ইতিহাস লিখেছেন নীলাঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, যশোধরা বাগচি, শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, দীপেশ চক্রবর্তী প্রমুখ। জয়া চ্যাটার্জি রচনা করেছেন দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতার তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত। আনাম জাকারিকা প্রকাশ করেছেন 'ফুটপ্রিন্ট অব পার্টিশানস্' নামক গবেষণা গ্রন্থ যাতে ১৯৪৭ সালের ৬৮ বছর পর চার প্রজন্মের স্মৃতি-সত্তা-অভিজ্ঞতায় দেশ

বিভাজনের নানা চিহ্ন ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আন্তরিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। 'ফুটপ্রিন্ট অব পার্টিশানস্' গ্রন্থের কাঠামোটি দেশভাগের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিঘাত প্রাপ্ত চৌদ্দজনের নিবিড় জবানবন্দিতে রচিত। সেখানে হাসান আজিজুল হকের বাল্যস্মৃতিতে ধরা থাকে পূজারি ব্রাহ্মণ পাঠশালার গুরুমশাইয়ের লক্ষ্মীপূজো শেষে গুরুমার সন্দেশ, নাড়ু, নকুলদানা ও প্রসাদ বিতরণ, কিংবা সন্ধেয় মুদির দোকানে কাশীদাসী মহাভারত পাঠের মৃদু একঘেয়ে সুর। একদা স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি হুসেন মুহাম্মদ এরশাদের স্মৃতিপটে আঁকা থাকে স্টেশনের পাশেই দুর্গাপুজোর মণ্ডপে আরতিনৃত্য, আর কদমা বাতাসা খেতে খেতে বন্ধুদের সঙ্গে মেলার মাঠ চষে বেড়ানো। রহমত আলির মনে পড়ে, প্রথম যখন পূর্ববঙ্গে গেছেন, তখন তাঁদের বাড়ির হিন্দু ম্যানেজার বিশ্বেশ্বর কাকার বাড়ির কথা, সরস্বতী পুজোর সব ব্যবস্থাই করে দিতেন তাঁর বাবা। দেশভাগের রক্তাক্ত বেদনার সঙ্গে সেখানে রয়েছে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির এ রকম অনেক গল্পই। একইভাবে ভারত ও পাকিস্তানে অবস্থিত দুই পাঞ্জাবের উদ্বাস্তু মহিলাদের অভিজ্ঞতাকে নানাভাবে পর্যালোচনা করে দেখে সেই প্রয়াসকেই এক নতুন মাত্রা দিয়েছেন উর্বশী বুটালিয়া (The other side of silence), নীলিমা দত্ত ('উজান স্রোতে'), রিতু মেনন আর কমলা ভাসিনরা (Borders and Boundaries)। আর প্রায় একই সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্র পান্ডের মতো বিদগ্ধজনেরাও বলেছেন যে, দেশভাগের আগুনে দগ্ধ হয়েছেন এমন মানুষদের দৃষ্টিকোণ থেকেই খুঁজে পেতে হবে দেশভাগের অন্যতর এক মানবিক ইতিহাস। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পর 'দেশভাগ'-এর আর এক ছবি ধরা পড়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব-পশ্চিম'(১৩৯৬), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'একটি কালো মেয়ের কথা' (১৩৭৮) প্রভৃতি উপন্যাসে। এই দেশভাগের ছবিতেও পূর্বঙ্গের দেশ-গাঁ ছেড়ে আসা ও পশ্চিমবঙ্গের বুকে আশ্রয় নেওয়া ছিন্নমূল মানুষ তথা উদ্বাস্তু মানুষের জীবন-বেদনার ভাষ্য প্রধান হয়ে উঠেছে। তবে পুর্ববাংলা থেকে হিন্দু বাঙালির উৎখাত হওয়া নিয়ে বাংলায় বেশ কিছু কথাসাহিত্য, কবিতা, গান ও নাটক লেখা হলেও বা চলচ্চিত্র নির্মিত হলেও পশ্চিম বাংলা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে বাঙালি মুসলমানের পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাওয়া নিয়ে সাহিত্য তুলনায় কম লেখা হয়েছে। পূর্ব ভারতবর্ষে যে আরও এক দল মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছিল ১৯৪৬-'৪৭ সালে এবং তারও পরে, বিহারি মুসলমানরা যে ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল, তাদের কথাও অনুক্ত থেকে গেছে, যেমন ইতিহাসে, তেমনই সাহিত্যেও। দেশভাগের পর পশ্চিম থেকে গণপ্রব্রজনের মাধ্যমে যারা পূর্ব পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল, তাদের একটা বড় অংশ ছিল অবাঙালি উর্দুভাষী মুসলমান, বিহারি মুসলমান। কী ভাবে তারা উৎখাত হল, কী হল তাদের উত্তরকালীন নিয়তি, তার উত্তর খোঁজেনি বাংলা বা হিন্দি সাহিত্য। এই মানুষগুলির ভাষা ছিল উর্দু, কিন্তু পশ্চিমের দেশভাগ নিয়ে উর্দু সাহিত্য মুখর হলেও, পূর্বের দেশভাগ নিয়ে তারা আশ্চর্যভাবেই নীরব। এদের নিয়ে একটি মাত্র উপন্যাসই নজরে আসে এবং তা হলো '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ ও দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা আবদুস সামাদ-এর 'দো গজ জমিন'। সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত এ উপন্যাসের বাংলা তর্জমার নাম ছিল 'সাড়ে তিন হাত ভূমি'।

সামগ্রিক এই পরিপ্রেক্ষিত থেকেই এবারে বাংলা সাহিত্যে দুই 'দেশভাগ' এর প্রভাব বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথম পর্যায়ে আসা যেতে পারে কবিতার কথায়। বাংলা কবিতায় ঘুরেফিরেই এসেছে দেশভাগজনিত স্মৃতিমদুরতা, বাস্তুচ্যুতির দুর্ভোগ সহ বাস্তুচ্যুত মানুষের শিকড়হীনতার বুকফাটা হাহাকার। বস্তুত এমন কবিতার সংখ্যাই বেশী। কিন্তু সেরকম কবিতার প্রসঙ্গে আমরা পরে যাবো। প্রথমেই আমরা এমন একটি কবিতার কথা বলবো যে কবিতার মধ্যে আমাদের প্রারম্ভিক আলোচনাক্রমের মূলসূত্রটি চোখে পড়ে। আমরা জীবনানন্দের '১৯৪৬-৪৭' কবিতাটির কথা বলছি। জীবনানন্দের '১৯৪৬-৪৭' কবিতায় রাজনীতির আড়ালে সাম্প্রদায়িক হিংসাশ্রয়ী ধর্মের সহসা লুকিয়ে পড়ার ছবিটি খুব সুন্দর ভাবে ফুটে ওঠে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সে বাস্তব প্রতিচ্ছবি কবির ভাষায়ঃ

'মানুষ মেরেছি আমি তার রক্তে আমার শরীর
ভরে গেছে পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার
ভাই আমি আমাকে সে কনিষ্ঠের মতো জেনে তবু

হৃদয়ে কঠিন হয়ে বধ করে গেল, আমি রক্তাক্ত নদীর
কল্লোলের কাছে শুয়ে অগ্রজপ্রতিম বিমূঢ়কে
বধ করে ঘুমাতেছি ...
যদি ডাকি রক্তের নদীর থেকে কল্লোলিত হয়ে
বলে যাবে কাছে এসে, 'ইয়াসিন আমি,
হানিফ মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ
আর তুমি?' আমার বুকের 'পরে হাত রেখে মৃত মুখ থেকে
চোখ তুলে শুধাবে সে রক্তনদী উদ্বেলিত হয়ে
বলে যাবে, গগন, বিপিন, শশী, পাথুরেঘাটার'

('১৯৪৬-'৪৭', শ্রেষ্ঠ কবিতা)

মৃত্যুই হয়তো মিতালি আনে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরস্পরের আঘাতে নিহত **হানিফ মহম্মদ, মকবুল, করিম, আজিজ আর গগন, বিপিন, শশীরা পরস্পরের দিকে অনুশোচনার ও গ্লানির দৃষ্টিতে চেয়ে নিঃশব্দে যে কথা বলে যায় সে কথা কি আমাদেরই সভ্যতার গ্লানি অথবা লজ্জার কথা নয়? ১৯৪৭ এর 'দেশভাগ' পূর্ববর্তী সময়টিতে বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বীভৎস আকার নিয়ে দেখা দেয়। জীবনানন্দ সব সময়ই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সপক্ষে সোচ্চার ছিলেন। কলকাতায় যখন ১৯৪৬ সালে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে কবি তখনই লেখেন ১৯৪৬-'৪৭ কবিতাটি। এ কবিতায় উঠে এসেছে এক গভীর মানবিক অন্বেষণ। বিশ্বযুদ্ধ পর্যায়ে মানুষের হিংসা আর রিরংসার বিপরীতে তিনি দেখেছেন আধুনিক মানুষের ভয়ংকর ভবিষ্যৎ। বিশ্বযুদ্ধক্লান্ত পৃথিবীর মানুষের কাছে যখন ঈশ্বর এবং বিশ্বাস দুটোই প্রায় ধ্বংস হতে বসেছে তখন কবির মনে হয়েছে – "কোথাও শান্তির কথা নেই তার, উদ্দীপ্তিও নেই ?" এ এক কঠোর বাস্তব। দাঙ্গাজনিত কারণে দেশত্যাগীদের অবস্থা নিরিখে সেই বাস্তবতাকে কাব্যে রূপ দিয়েছেন তিনি। কবিতার শুরুতেই আছে দেশত্যাগকারী পলায়নকামী মানুষের সেই গোপন 'অস্পষ্ট ব্যস্ততা'। তিনি জানেন বাংলার ভূখণ্ডে একদিন হিন্দু ও মুসলমানের এক স্বাভাবিক সহাবস্থান ছিল। সেই ঐতিহ্য অথবা পরম্পরার বর্ণনাও আছে এখানে। এ কবিতায় কবি তুলে ধরেন দাঙ্গার সময়কার চিত্র। দাঙ্গার অন্তরালে লুকিয়ে থাকা প্রকৃত সত্যকে কেউ উপলব্ধি করতে পারেনি। আর যারা পেরেছে তারা তাকে সম্পূর্ণ সত্য বলে প্রকাশ করতে পায়নি সাহস। তাই এই সত্য হয়ে উঠেছে এক অর্ধসত্য। কবি তাঁর অনুভূতির মধ্যে দিয়ে সেই ভাবনাগুলিকেই তুলে ধরার চেষ্টা করেন। জীবনের চেয়ে ধর্ম আর ধর্মের চেয়ে রাজনীতি বেশি বড় হলে তা পরিণতিতে কত বেশি ভয়াবহতায় পৌঁছুতে পারে তার প্রামাণ্য রূপকেই আমরা প্রত্যক্ষ করি ১৯৪৬-'৪৭ কবিতায়। অন্ধ রাজনীতির আশ্রয় অথবা প্রশ্রয় মানুষের সারল্যকে মুছে দেয়। তারই মধ্য থেকে জন্ম নেয় ইতর খাতক অথবা মহাজন নামক মিডলম্যান অথবা কোনো নারীলোভী শয়তান। নিলামের বাজারে মনুষ্যত্বের এই ছবিকে বিক্রীত হতে দেখেন কবি। কবি দেখেন আধুনিক মানুষ বেঁচে আছে শুধু দেহে। তার মন ও মননের ঘটেছে মৃত্যু। তাই এতো বিচ্যুতি, এতো ফাটল, অবক্ষয় আর অন্তঃসারশূণ্যতা।** সমর সেন লিখেছিলেন, নোয়াখালির হিন্দু আর বিহারের মুসলমানের দাঙ্গার প্রেক্ষিতেঃ 'বাংলায় বিহারে গড়মুক্তেশ্বরে / বিকলাঙ্গ লাশ কাঁধে / লোক চলে গোরস্থানে / কিম্বা পোড়াবার ঘাটে।' এও হয়তো জীবনানন্দেরই সেই জীবনভাষ্য যাতে প্রতিবিম্বিত হয় সব ধর্মীয় গোষ্ঠী, সব জাতিগোষ্ঠীর সকলেই যেন সকলকে আড়চোখে দেখে। আর সৃষ্টির মনের কথাও বোধ হয়, দ্বেষ। এই দ্বেষ থেকে সৃষ্টি যত হিংসা, জাতিবৈরীতা, দাঙ্গা, রক্তপাত। পূর্ববঙ্গ থেকে সংখ্যালঘু প্রতিবেশী হিন্দুদের দেশত্যাগের ফলে যে শূণ্যতার সৃষ্টি হয় তার প্রতিফলন ঘটেছে কবি জসীমউদ্দিনের 'বাস্তুত্যাগী' কবিতার ছত্রে। তারই কয়েকটি পংক্তিঃ

দেউলে দেউলে কাঁদিছে দেবতা পূজারীর খোঁজ করি...
ফিরে এসো যারা গাঁ ছেড়ে গেছো, তরুলতিকার বাঁধে,
তোমাদের কতো অতীত দিনের মায়া ও মমতা কাঁদে।

সুপারির বন শূন্যে ছিঁড়িছে দীঘল মাথার কেশ,
নারকেলতরু ঊর্দ্ধে খুঁজিছে তোমাদের উদ্দেশ।...
অতীতে হয়তো কিছু ব্যথা দেছি, পেয়ে বা কিছুটা ব্যথা,
আজকের দিনে ভুলে যাও ভাই, সেসব অতীত কথা!

কবি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'পূর্ব-পশ্চিম' এবং 'উদ্বাস্তু' কবিতায় দেশভাগের আবেগময় যন্ত্রণা প্রতিফলিত হয়েছে। 'পূর্ব-পশ্চিম' কবিতায় পূর্ব ও পশ্চিমের বাংলার নিবিড় ভৌগোলিক ঐক্য ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের কথা ব্যক্ত হয়েছে। 'উদ্বাস্তু' কবিতায় তিনি একটি ছিন্নমূল পরিবারের উদ্বাস্তু হয়ে যাবার নিদারুণ বেদনাময় চিত্র তুলে ধরেছেন। কবিতার শেষে আমরা এক নির্মম সত্যের মুখোমুখি হই যখন কবি বলেনঃ 'আমরা সবাই উদ্বাস্তু --- / কেউ উৎখাত ভিটে-মাটি থেকে, / কেউ উৎখাত আদর্শ থেকে।' তখন সহজেই যেন আমরা তথাকথিত সাম্প্রদায়িক অস্ত্রের হাতে মানবধর্মের শেষ মৃত্যু আর্তনাদটুকু শুনতে পাই। সমকালীন আর এক প্রথিতযশা কবি শঙ্খ ঘোষ জন্মভূমি, ছেড়ে আসা গ্রাম ও তার যন্ত্রনা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু জীবনের দুর্ভোগ, শিকড়হীনতার বেদনার কথা বারবারই তাঁর কবিতায় তুলে ধরেছেন। তিনিই হয়তো বলতে পারেনঃ 'আমার বুকে পালানোর পালানোর আরো পালানোর দেশজোড়া স্মৃতি।' 'স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে' কবিতায় কৃত্রিম মানচিত্র সর্বস্ব জাতিরাষ্ট্রকে কবি শংখ ঘোষ এক মানবিক প্রশ্নচিহ্নের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে বলেনঃ

তুমি মাটি? কিংবা তুমি আমারই স্মৃতির ধূপে ধূপে
কেবল ছড়াও মৃদু গন্ধ আর আর – কিছু নও?
রেখায় রেখায় লুপ্ত মানচিত্র-খণ্ডে চুপিচুপি---
বাল্যসহচর! তুমি মাটি নও দেশ নও তুমি
....
তুমি দেশ? তুমিই অপাপবিদ্ধ স্বর্গাদপি বড়ো?
জন্মদিন মৃত্যুদিন জীবনের প্রতিদিন বুকে
বরাভয় হাত তোলে দীর্ঘকায় শ্যাম ছায়াতরু
সেই তুমি? সেই তুমি? বিষাদের স্মৃতি নিয়ে সুখী
মানচিত্ররেখা, তুমি দেশ নও মাটি নও তুমি!

পাল্টে যাওয়া সময়ের অনুভাবনায় রঞ্জিত শঙ্খের 'পুনর্বাসন' কবিতাটি। কবিতার বিষয় উদ্বাস্তু জীবন। স্বাধীনতা পরবর্তী উন্মূল জীবন। উদ্বাস্তু মানুষের স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে তাঁর কবিতার 'পুনর্বাসন' কথাটির সাথে। এ কবিতায় যখন ফেলে আসা উন্মূল জীবনে চারপাশের ঘাস, পাথর, সরীসৃপ ভাঙা মন্দিরকে পশ্চিমের উদয়াচলের পথে মিলিয়ে যেতে দেখেন কবি, মিলিয়ে যেতে দেখেন, তীর-বল্লম, ভিটে-মাটি আর উলকি ধরা দেয়ালের মতো প্রতিবাদী গ্রামীণ অথবা আদিম চেতনার রূপকে ধ্বংস আর ধ্বস্ত সময়ের পরিমণ্ডলে তখনই পরিবর্তিত সময়ের পটভূমিতে তাদেরই চারপাশে জেগে ওঠে শেয়ালদার ভরদুপুর, কানাগলি, স্লোগান, মনুমেন্ট। প্রতিবাদের অনুষঙ্গ এখানেও আছে, কিন্তু কবি যখন বলেন:

স্মৃতি যেন দীর্ঘযাত্রী দলদঙ্গল
ভাঙা বাক্স প'ড়ে থাকে আমগাছের ছায়ায়
এক পা ছেড়ে অন্য পায়ে হঠাৎ সব বাস্তুহীন।

তখন বাস্তুহারার বেদনা সমকালীন জীবন-যন্ত্রণাকে স্পর্শ করে না কি? মাত্র দু পায়ের পথ চলার ফাঁকে যে এত ফাঁকি তা কি কেউ তাঁর আগে ভাবতে পেরেছিল? তাই তাঁর 'বাস্তুহীন' কথাটা যেন মনে দাগ রেখে যায়। বিষ্ণু দে তাঁর

'জল দাও' কবিতায় যেমন 'দেশভাগ'-এর এক জীবন্ত ছবি তুলে ধরতে লেখেনঃ 'এখানে ওখানে দেখ দেশছাড়া লোক ছায়ায় হাঁপায় / পার্কের ধারে শানে পথে পথে গাড়িবারান্দায় / ভাবে ওরা কী যে ভাবে! / ছেড়ে খোঁজে দেশ / এইখানে কেউ বরিশালে কেউ কেউ বা ঢাকায়...' তেমনই যেন শংখ ঘোষের এ কবিতা। **সেই বাস্তুহারার দল...যাদের মেলেনি পুনর্বাসন, শুধু যারা পেয়েছে পুনর্বাসনের আশ্বাসই...প্রশ্ন জাগে কবিতাটি কি শুধু তাদেরই জন্য? আমাদের জন্য নয়? আমরা যারা ব্রাত্য শৈশবের সোনাঝরা পথ, কবির ভাষায় 'চারপাশের ঝর্ণা', 'উড়ন্ত চুল', 'উদোম পথ','ঝোড়ো মশাল' আর 'ভোরের শব্দ-স্নাত শরীর' থেকে তারাই তো অন্তরের গহীনে আজো মশালচী! কবিতার শেষে কবি আরো বলেনঃ**

সমস্ত একসঙ্গে ঘুরে আসে স্মৃতির হাতে
অল্প আলোয় বসে থাকা পথ ভিখারি
যা ছিল আর যা আছে দুই পাথর ঠুকে
জ্বালিয়ে নেয় এতদিনের পুনর্বাসন।

এ কবিতার কোথায় যেন খুঁজে পাই জীবনানন্দের সেই আর এক 'বিপন্ন বোধ' যা আমাদের রক্তের মধ্যে, চেতনার মধ্যে খেলা করে। জীবন রূপ শ্মশান-শিবের ধুনীর আগুনের চারপাশে আজ শুধুই মৃত্যু। তাদের একেকটা দিন আজ হাজার হাজার দিনের জন্ম-মৃত্যুর ক্ষুধা হয়ে শহুরে আত্মায় জেগে থাকে। আর কবি কালের তকলিতে চেতনার সুতো গলিয়ে মিলিয়ে নেন পুরনো আর নতুনকে। উদ্বাস্তুদের দেশহীনতার কথা খুঁজে পাই তাঁর 'দেশহীন' কবিতায়। কবি বলেনঃ 'আমার মুখে অন্তহীন আত্মলাঞ্ছনার ক্ষত / আমার বুকে পালানোর পালানোর আরো পালানোর দেশজোড়া স্মৃতি...।' আর 'মন্ত্রীমশাই' কবিতায় তো কবি দেশভাগের কুটিল রাজনীতির সমালোচনাও করেছেন। আর সেই রাজনীতির বলি উদ্বাস্তুদের অসহায়তার কথা তুলে ধরেছেন এভাবেঃ

সবাইকে পথ দেবার জন্য কয়েকজনকে সরতে হবে।
তেমন-তেমন সময় এলে হয়তো আমায় মরতে হবে
বুঝতে পারি।
এ-যুক্তিতেই ভিটেমাটির ঊর্ণা ছেড়ে বেরিয়েছিলাম...
কিন্তু সবাই বললো সেদিন, হা কাপুরুষ, হৃদ্দ বাঙাল
চোরের মতো ছাড়লি নিজের জন্মভুমি।
জন্মভুমি? কোথায় আমার জন্মভুমি? খুঁজতে খুঁজতে জীবন গেল।
দিন কেটেছে চোরের মতো দিনভিখারি ঘোরের মতো
পথে-বিপথে...

কবি মনীন্দ্র রায় তাঁর একাধিক কবিতায় উদ্বাস্তু জীবনের দুর্ভোগ এবং অসহায়তার কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর এরকম একটি কবিতা হল 'চিঠি'। যেখানে তিনি এক উদ্বাস্তু বৃদ্ধার ছেড়ে আসা গ্রামজীবনের এক নস্ট্যালজিক অনুভূতিকে তুলে ধরেছেন। কবিতার ভাষায় এ অনুভূতিঃ 'সুশান্ত, তোমার মনে পড়ে / সরলার মাকে, যে এখানে / কাজ করত? হঠাৎ সেদিন / শুনলো যেই বন্যা পাকিস্তানে, / বুড়ি গিয়ে বসল বারান্দায়, / দেখি তার চোখে জল ঝরে...।' দেশত্যাগী বৃদ্ধার এ হৃদয় নিংড়ানো, অশ্রুসিক্ত অনুভূতিকে কোনো ভাষা দিয়ে বোঝানো যায় না। একালের কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উদ্বাস্তু জীবনের দুর্ভোগ, দুর্দশা আর স্মৃতি কাতরতার কথা ব্যক্ত করেছেন তাঁর নানা ছোটগল্প, উপন্যাস ও কবিতায়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অসংখ্য কবিতায় ঘুরে ফিরে এসেছে দেশভাগ, ছেড়ে আসা গ্রাম, নদী, প্রকৃতি ও মানুষজনের কথা। তাঁর লেখা এরকমই কয়েকটি কবিতা হল 'ধাত্রী', 'জনমদুখিনী', 'যদি নির্বাসন দাও', 'দুঃখের গল্প', 'ফিরে যাবো' ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'ধাত্রী' কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। 'ধাত্রী' কবিতায় সুনীল উদ্বাস্তু সমস্যা জর্জরিত বাংলাকে ধাইমার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায়ঃ

শিয়ালদার ফুটপাতে বসে আছেন আমার ধাইমা
দুটো হাত সামনে পেতে রাখা,
ঠোঁট নড়ে উঠছে মাঝে মাঝে।
যে কেউ ভাববে দিনকানা এক হেঁজিপেঁজি বাহাত্তুরে রিফিউজি বুড়ি।
আঁতুর ঘরে আমার মুমূর্ষু মায়ের কোল থেকে উনি
একদিন আমাকে বুকে তুলে নিয়েছিলেন...
দাইমা, এ কোন্ পৃথিবী আমাকে দেখালে?
বুড়ি, সর্বনাশিনী, আমাকে কেন বাঁচিয়ে রেখেছিলি
এই অকল্পনীয় পৃথিবীতে
আমি আর কত কিছু হারাবো?

এ বর্ণনায় ফেলে আসা দেশভাগ-এর দুঃখ কাতর স্মৃতি আমাদের সকলের মনকে ভারাক্রান্ত করে। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'শুকনো মুখ উস্কোখুস্কো চুল' এ প্রসঙ্গে এক অসাধারণ কবিতা। কবির ভাষায়ঃ

শুকনো মুখ উস্কোখুস্কো চুল
শিয়ালদার প্ল্যাটফর্মে আছড়ে-পড়া উদ্বাস্তু সংসারে
বিষাদপ্রতিমা...

... ...

হারানো মা, আমারে কি হারানিধি বলে মনে ধরে!

মঙ্গলাচরণের 'এস দেখে যাও' কবিতার কয়েকটি চরণঃ

এস দেখে যাও কুটি কুটি সংসার
স্টেশণের প্ল্যাটফর্মে ছড়ানো বে-আব্রু সংসারে
স্বামী নেই, গেল কোথায় তলিয়ে
ভেসে এসে আজ ঠেকেছে কোথায় ও-যে
ছেঁড়া কানিটুকু কোমর জড়ানো আদুরি, ঘরের বউ-
আমার বাঙলা।

এখানে 'আমার বাঙলা' কথাটি যেন এক ব্যঙ্গাত্মক আয়রনি হয়ে আমাদের চোখে ছুরির মতো বিঁধে যায়।

আলোচনার দ্বিতীয় তথা শেষ পর্যায়ে রাখা যেতে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস ও ছোটগল্পকে 'দেশভাগ' বিষয়ে বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে যা খুবই প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। দেশভাগের প্রত্যক্ষ ও ভয়ঙ্কর রূপ পশ্চিম পাকিস্থান সহ ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে অপেক্ষাকৃত কম ছিল। তাই, বাংলা কথাসাহিত্যে দেশভাগের প্রভাবও তুলনামূলকভাবে কম। পাঞ্জাবে দেশভাগের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক। সাদাত হাসান মান্টো, কৃষণ চন্দর, ভীষ্ম সাহনী দেশভাগ ও দাঙ্গা নিয়ে এমন সব অসাধারণ গল্প লিখেছেন, যার তুল্য দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে খুব কমই আছে। পাঞ্জাবের তুলনায় পুবের উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ও যাত্রাপথের ভয়াবহতা তুলনামূলক ভাবে কম ছিল বলেই হয়তো বঙ্গ-বিভাজন এ যুগের ইতিহাসচর্চা বা সাহিত্যচর্চায় কম জায়গা পেয়েছে। বাংলায় দেশভাগ সম্পর্কিত ধর্ষণ, অপহরণ, ধর্মান্তর সেই পরিমাণে হয়নি বটে কিন্তু ধর্ষণ, অপহরণ অথবা ধর্মান্তরের ভয় সবসময়েই ছিল এবং সেই ভয়ই প্রধানতঃ মানুষকে তার দেশ অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ ছাড়তে বাধ্য করেছিল। সংখ্যাধিক্যে না হলেও বাংলা কথাসাহিত্যের বিষয় হিসেবে দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, দাঙ্গা ও উদ্বাস্তু সমস্যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তর পরবর্তী সবচেয়ে বড় ঘটনা হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিশেষতঃ আনামের গ্রন্থে ('ফুটপ্রিন্ট অব পার্টিশানস্') ইতিহাসের সত্যান্বেষী ও নির্মোহ ধারার বাইরে সাহিত্যের

নানা অঙ্গনে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের দেশবদলের স্মৃতি, দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গের (তখন পূর্ব পাকিস্তান) অভিমুখে পাড়ি দেওয়ার মর্মপীড়াদায়ক কাহিনীর মতোই পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের দেশান্তরের কিছু বিবরণ এসেছে। 'দেশ' নামক বস্তুটির জন্য পৃথিবীর সমস্ত বাস্তুহারা ছিন্নমূল মানুষের নিরন্তর অন্বেষণ এবং তার ব্যর্থতার হাহাকার প্রতিধ্বনিত হয়েছে তাঁর রচিত স্মৃতিমালাতে। এটাও লক্ষ্য করার বিষয় যে, পূর্ব ভারতের দেশভাগ ও ভিটে থেকে উৎখাত-হওয়া হিন্দু শরণার্থীদের কাহিনী যেমন জটিল মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে চলে যাওয়া বাঙালি মুসলমানদের গল্পটিও তেমনই জটিলতর। উভয় সম্প্রদায়ই স্বাধীনতার স্বাদ নিয়েছেন এবং শরণার্থীও হয়েছেন। এক জীবনের আস্বাদবাহী দুটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের আশ্রয়চ্যুত হয়ে নোঙরহীন নৌকোর মতো অনিশ্চিতের পথে দুটি বিপরীত দিকে ছিটকে যাওয়া ও তারপর স্বপ্নিল আবেগে নিজস্ব মাটি খোঁজার স্বপ্ন ও অভিজ্ঞতা ইতিহাসের কাছে কখনোই কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। ব্যক্তি অনেক কিছুই ভুলতে পারে, কিন্তু ইতিহাসকে তাঁর বিস্মৃতির দায় এড়াতে হয়। তবে দ্বিতীয় যে দেশভাগের ('৭১ পরবর্তী) কথা আমার আলোচনায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি তার একটি চমৎকার অসাম্প্রদায়িক দিক তুলে ধরেছেন প্রাবন্ধিক ও সমালোচক অশ্রুকুমার সিকদার। তাঁর ভাষায় উদ্বাস্তু জীবনের সে বর্ণনাঃ "স্টিমারে-ট্রেনে একসঙ্গে যেতে যেতে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পিণ্ড পাকিয়ে থাকতে থাকতে, ক্যাম্পজীবনের সর্বজনীনতায় ভেঙে গেল খাদ্যাভ্যাসের, ছোঁয়াছুঁয়ির, জাত-পাতের অনেক সংস্কার। কলোনিগুলিতে ছত্রিশ জাতের একত্র বসবাসে, ওঠায়-বসায়, সংগঠনে-সংগ্রামে ভেঙে যেতে লাগল ভেদ আর সংস্কারের বেড়াজাল।" অদ্ভুত হলেও এ এক ধ্রুব সত্য বলেই আমাদের মেনে নিতে হয়।

দেশভাগ ও দাঙ্গা বিষয়ক বেশকিছু উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আবু ইসহাকের 'সূর্য দীঘল বাড়ী', জীবনানন্দ দাশের 'জলপাইহাটি', অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'গড় শ্রীখণ্ড', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অর্জুন', 'পূর্ব পশ্চিম', অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জীবন রহস্য', শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পারাপার', শঙ্খ ঘোষের 'সুপুরিবনের সারি', আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা', প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকো', সাবিত্রী রায়ের 'বদ্বীপ', 'স্বরলিপি', গৌরকিশোর ঘোষের 'প্রেম নেই', অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'নির্বাস', রমেশ চন্দ্র সেনের 'পুব থেকে পশ্চিমে', মনোজ বসুর 'এপার ওপার', হাসান আজিজুল হকের 'আগুনপাখি' শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক' ইত্যাদি। অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের "স্বাক্ষর", মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ''ভালবাসা'', ''ছেলেমানুষি'', সুবোধ ঘোষের ''অযান্ত্রিক'', নরেন্দ্র মিত্রের ''হেডমাষ্টার'', ''পালঙ্ক'', মহাশ্বেতা দেবীর ''উর্বশী ও জনি'', ''সাঁঝ সকালের মা'', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ''ইজ্জত'', শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ''দখল'', মনোজ বসুর ''গান্ধিটুপি'', অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ''কাফের'', সমরেশ বসুর ''আদাব'', ''পসারিণী'', সতীনাথ ভাদুড়ীর ''গণনায়ক'', ঋত্বিক ঘটকের ''স্ফটিক পাত্র', "মড়ক", প্রফুল্ল রায়ের "মাঝি", গৌরকিশোর ঘোষের "যাহা যায়", রমেশ চন্দ্র সেনের "পথের কাঁটা", দিনেশচন্দ্র রায়ের "কুলপতি", সন্তোষ কুমার ঘোষের "দ্বিজ", সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের ''একটি তুলসী গাছের কাহিনী", আবু রুশদের ''হাড়'', আলাউদ্দিন আল আজাদের ''ছুরি'', ''শিকড়'', শওকত ওসমানের ''আলিম মুয়াজ্জিন'', ''আখেরী সংক্রান্ত'', সরদার জৈন-উদ্দীনের ''ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা'', আবু ইসহাকের ''বনমানুষ'', ''হারেম'', হাসান হাফিজুর রহমানের ''মানিকজোড়", ''আরো দুটি মৃত্যু'', ''মাছ'' এবং হাসান আজিজুল হকের ''উত্তর বসন্তে'', ''আত্মজা ও একটি করবী গাছ'', ''পরবাসী'', ''মারী'', ''খাঁচা'', ''একটি নির্জল কথা'' ইত্যাদি গল্পের বিষয়ও ছিল দেশভাগ, দাঙ্গা ও দুর্ভিক্ষ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'একটি কালো মেয়ের কথা' উপন্যাসে দেখা যায়, ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের পর পূর্ববাংলা থেকে পালিয়ে আসতে থাকা লক্ষ মানুষের একজন ডেভিড মনসুর সীমান্ত অতিক্রম কালে ধরা পড়ে। কয়েকজন উৎসাহী তরুণ তাকে গুপ্তচর সন্দেহে ধরে এনে পুলিশের হাতে দিয়ে দেয়। তার সঙ্গে ছিল একটি রুগ্ন কালো মেয়ে নাম যার নাজমা। জিজ্ঞাসাবাদের সময় মার খেয়েও লোকটা চিৎকার করে বলতে থাকে সে গুপ্তচর নয়। ধর্মে সে ক্রিশ্চান, তালতলায় বর্ধিত, বাবা ছিল রেলের ইয়ার্ড অফিসার, মা নার্স। ডেভিড পশ্চিম পাকিস্তানে অনেকদিন থেকেছে, ভালো উর্দু জানে, পূর্ব পাকিস্তানেও সে থেকেছে দশ বছর। বাল্যাবধি তার ঝোঁক ছিল গান ও

বিদ্যুতের কাজে। নয় বছর এক বড় ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার্স ফার্মে কাজ করেছে। তার জবানবন্দী থেকেই জানা যায় পূর্ব পাকিস্তানে আয়ুব খাঁর নিয়ন্ত্রণ ও সেখানে আমোদ প্রমোদের জন্য পশ্চিম পাক ব্যবসায়ীদের আগমন প্রভৃতির কথা। এ উপন্যাসে ধর্ষিতা নাজমা যেন ধর্ষিতা বাংলারই বাস্তব প্রতিবিম্ব। উপন্যাসটির যথেষ্ট সামাজিক ও সাহিত্যিক মূল্য রয়েছে। অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের 'স্বাক্ষর' গল্পের খেটে খাওয়া মজুর জহুরালী আর দীননাথ ইঁট আর সোডার বোতল নিয়ে দাঙ্গায় নামে। মিলিটারীর ভয়ে অবশেষে তারা দুইজনে আশয় নেয় এক বাড়ির সিঁড়ির তলায়। সেখানেই একজনের বিড়ি আর অন্যজনের দেশলাই কাছে আনে পরস্পরকে। তারা উভয়েই বুঝতে পারে আসলে সাধারণ হিন্দু-মুসলমান নয়, দেশভাগের কলকাঠি আছে যারা দাঙ্গা বাঁধায় সেইসব চক্রী নেতাদের হাতেই। সমরেশ বসুর 'আদাব' গল্পেও একজন সুতামজুর আর একজন নৌকার মাঝি পরস্পর হিঁদু আর মোসলমান হওয়া সত্ত্বেও দাঙ্গার দিনে এক সাথে বিড়ির টানে মিলে যায়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সীমান্ত' কিংবা 'ইজ্জত' গল্পেও এমনটি দেখতে পাই। 'ইজ্জত' গল্পে ধলা মন্তাই আর জগন্নাথ পরস্পর মিলে যায়। আমাদের সংস্কারের মধ্যেও কত রিরংসা জন্ম নেয় দেশভাগের তাণ্ডবে তারই এক কথাচিত্র দেখতে পাই সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'মহাকাল' উপন্যাসে। একদিন যে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণকণ্যা বিধবা গায়ত্রী বিয়ে করতে রাজী ছিল না মহেন্দ্রকে, সেই-ই যখন দাঙ্গায় অপহৃতা হয়ে মুসলমান যুবাকে নিকাহ্ করতে বাধ্য হয় ও তারপর তাকে উদ্ধার করা হয় তখন মহেন্দ্র ভাবে এবার গায়ত্রী তার প্রস্তাব ফেরাতে পারব না। কারণ 'যে ধাক্কা আজ হিন্দুসমাজ পেল তা যত মর্মান্তিক হোক্ না কেন, তারও প্রয়োজন ছিল। নইলে বিধি-নিষেধের এই জগদদল পাথর কিছুতেই ঠেলে যেত না।' স্বার্থবুদ্ধি দিয়ে ধর্মকে ব্যাখ্যা করার এ অমানুষিক অদ্ভুত প্রয়াস গল্পটি না পড়লে বোঝা যায় না।

তবে 'দেশভাগ' নিয়ে বাংলায় লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে সেরা উপন্যাস মনে হয় ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী দেশভাগের পটভূমি নিয়ে লেখা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব-পশ্চিম'। 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে সুনীল বলেছেন—'এই উপন্যাসের পশ্চাৎপটে আছে সমসাময়িক ইতিহাস, বেশ কিছু রাজনৈতিক পালাবদল, কিছু আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বকে উপস্থিত করা হয়েছে সরাসরি।' অন্যদিকে উপন্যাসটি প্রসঙ্গে সুনীল এক সাক্ষাৎকারে বলেন—'পূর্ব-পশ্চিম লেখার সময় আমার মাথায় ছিল দেশভাগ এবং দুদিকের বাঙালিরা। তারা যে ভাগ হয়ে গেছে এটা। এইটা একটা পূর্ব-পশ্চিম, আরেকটা পূর্ব-পশ্চিম হচ্ছে ১৯৬০ থেকে ৭০-এর দশকে শুরু হল। এদেশের যারা ভাল ভাল ছেলে মেয়ে তারা সব পশ্চিমে চলে যেতে লাগল, বাবা মাকে ফেলে। সেখানেও একটা পূর্ব-পশ্চিম ভাগ হয়ে যায়। এটাই ছিল থিম।' দুই বাংলার কয়েকটি পরিবারের কাহিনী নিয়ে লেখা এই উপন্যাস। 'পূর্ব-পশ্চিম' দুখণ্ডে বিন্যস্ত উপন্যাস, ১৯৫০ থেকে ১৯৫২ এবং ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ যার কালসীমানা। মামুন, প্রতাপ ও বিমানবিহারীর পরিবার পরিজন উপন্যাসে বড় ভূমিকা নিলেও এতে গৌণ চরিত্রের সংখ্যা কম নয়। প্রথম খণ্ডে যেমন কলকাতার উনিশ ও বিশ শতকের সমাজগঠনের কথা আছে তেমনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ফাটল, জেনারেল গোলাম মহম্মদ ও ফজলুল হকের বৈরিতা, কুমিল্লা রণাঙ্গনের বিবরণ, তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের ভারতীয় ট্রেনিং, কাদের সিদ্দিকির বীরত্ব, সিরাজুলের আক্রমণ ও আত্মাহুতি, চল্লিশের শেষে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর পশ্চিমবঙ্গে আগমন প্রভৃতি বিষয় ছাড়াও দেশ ভাগ সংশ্লিষ্ট বিড়ম্বনা, গণহত্যা, কারফিউ, মুক্তিবাহিনীর জয়, শরনার্থী শিবির সহ আপনজনদের সাথে বিচ্ছেদ ইত্যাদি সব বিষয়গুলিকেই অত্যন্ত নিপুন হাতে এ উপন্যাসে তুলে ধরেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। এ উপন্যাসে রিফিউজি হারীত মন্ডল কলকাতা সম্পর্কে একসময় বলে: "সত্যই আইশ্চর্য শহর। শিয়ালদহ ইস্টিশনে রিফিউজি থিকথিক করত্যাছে, তারই মধ্য দিয়া হৈ হৈ করতে করতে বনভোজন পার্টি যায়।" এমনই প্রতিক্রিয়া ছিল সেদিন রিফিউজিদের প্রতি আজব এ কলকাতা শহরের। এ উপন্যাসে ধর্মের দোহাই দিয়ে আর রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য যুগ যুগ ধরে একসাথে মিলে মিশে বাস করা মানুষগুলোর দুই বাংলার বিভাজনের ফলে একে অপরের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়াটাও শুধু ঐতিহাসিকই নয় মর্মান্তিকও বটে। উপন্যাসটির ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক মূল্য রয়েছে। দেশভাগ ও দাঙ্গা সম্পর্কিত আর একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হলো প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকা'। এ উপন্যাসটিতে ঔপন্যাসিক বাস্তবভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান

ত্যাগ করতে বাধ্য হওয়া ও পশ্চিমবাংলায় আশ্রয় নেওয়া শরণার্থী মানুষদের অমানুষিক কষ্ট। দেশভাগের পর ওপার বাংলার বাঙালেরা এপার বাংলার ঘটিদের কাছে কীভাবে তাচ্ছিল্যের শিকার হয়েছিল তাও নিপুণ ভাবে ফুটে উঠেছে এ উপন্যাসে।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসটিও 'দেশভাগ' সম্পর্কিত উপন্যাস। এ উপন্যাসে আছে পূর্ববাংলার এক ছোট্ট গ্রামের কথা। আর সেই ছোট্ট গ্রামটির মধ্যে দিয়েই যেন গোটা বাংলাকে তাঁর উপন্যাসের মধ্যে তুলে ধরেছেন লেখক। এ এক এমন বাংলা যেখানে সামসুদ্দিন আর রঞ্জিত মালতীকে নিয়ে ছোটে ধানের শীষ কুড়াতে, সেখানে দুর্গাপুজোর দিন অমলা আর কমলা পরী সেজে ঘোড়ার গাড়িতে ঘুরে বেড়ায়, সেখানে বড় বৌমণি ঠাকুর বাড়িতে সন্ধ্যায় ধুপ দেয়, সেখানে এখনো কাঁঠাল গাছটার নীচে ঠাই অপেক্ষা করে থাকে ফতিমা তার প্রিয় সোনা ঠাকুর আসবে বলে, তারপর ওরা ছুটবে ধান খেতের আল ধরে। সেখানে কবরে শুয়ে আছে চির দুঃখিনী জালালি, জুটন বসে থাকে চুপচাপ, নরেন দাস বেঁচে থাকে শূন্য দৃষ্টি মেলে, আবেদালি এখনো কাঁদে তার কুলাঙ্গার ছেলের নষ্ট কাজের জন্য, আন্নুকে এখনো সন্দেহ করে ফেলু আর তার পঙ্গু হাতটা নিয়ে বিড়বিড় করে বলে উঠে –'হালার কাউয়া...' সেই মাঠ, পাটক্ষেত, চারিদিকে সবুজ ধান আর নদীর জীবনে বয়ে যায় মানুষগুলির অনন্ত জীবন সংগ্রাম। গল্পের খাতার বাইরে এসে উল্টো সুরে আমাদের পথ দেখায় ছোট্ট সোনা আর ঘাটে তখনও পাটাতনের উপর অপেক্ষা করে থাকে ঈশম, সে যেন বলতে চায়--চলো এবার সোনালি বালির নদীর তলে হারিয়ে যাই, হারিয়ে যাই রূপকথার নৌকা তুলে আনার জন্য। বিশাল দৈত্যের হাত থেকে উদ্ধার করলেই ভেসে উঠবে সোনার নৌকা, রুপার বৈঠা, ভাসতে ভাসতে একদিন দেখা যাবে অনেক দূরের খোয়াই যার উপরে রয়েছে নীল আকাশ আর উড়ছে হাজার হাজার নীলকণ্ঠ পাখি। এ গল্প দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মনে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতিই শুধু নয়, এক নস্ট্যালজিক অনুভূতি ও সকাতর বেদনারও জন্ম দেয়। এ উপন্যাসের প্লট শুরু স্বাধীনতার আগে থেকে। এতে রয়েছে রায়টের বাস্তব চিত্র সহ মুসলিম লীগের তৎপরতার কথা। তবে সব থেকে বেশী করে আছে ধানের শীষে আর নদীর বহমানতায় ফেলে আসা বাংলা আর বাঙালির স্মৃতি-স্বপ্নের রোমন্থন। আর আছে রায়টের ফলে ধর্ষিতা নারী মালতী যে বারে বারেই আত্মহত্যার চেষ্টা করে। প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাস 'কেয়াপাতার নৌকা'-র ঝিনুকও দিনরাত শুন্য ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে থাকে। আর হেমনাথ ভাবে কেন সে দেশ ছাড়বে? কোনো অন্যায় তো করেনি সে? জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসের নায়িকা সুতারা যখন নিরাশ্রয় তখন তার বাল্যবন্ধু সাকিনা তাকে প্রস্তাব দেয় বিয়ে করে সুতারা তাদের পরিবারের একজন হয়ে যাক। কিন্তু সুতারা তা পারে না কারণ, যে সম্প্রদায়ের মানুষ তার বাপকে মেরেছে, মাকে মেরেছে, দিদিকে অপহরণ করেছে সেই সম্প্রদায়ের মানুষকে সে আপন করে নেবে কেমন করে? নারীর এই কুণ্ঠা অথবা নিতল, নিস্তব্ধ নীরবতাও তো দেশভাগ থেকেই পাওয়া! গৌরকিশোর ঘোষের 'প্রতিবেশী' উপন্যাসের শেষে দেখি মুসলিম লিগের ডাকা ডিরেক্ট অ্যাকশানের দরুণ অমিতা আর শামিম প্যারাগনে মিলতে পারে না আর তাহের তার ব্রাহ্মণ বন্ধুকে গোমাংস খাওয়ানোয় তাহেরের দাদি তাহেরকে খড়মপেটা করে। সমরেশ বসুর 'সওদাগর', রমেশচন্দ্র সেনের 'পুব থেকে পশ্চিমে', জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারো ঘর এক উঠান', মাহমুদুল হকের 'কালো বরফ', হাসান আজিজুল হকের 'আগুনপাখি',মিহির সেনগুপ্তের 'বিষাদবৃক্ষ', অভিজিৎ সেনের 'স্বপ্ন ও অন্যান্য নীলিমা' ইত্যাদি উপন্যাসগুলিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তবে সেলিনা হোসেনের 'গায়ত্রীসন্ধ্যা' গল্পটি 'দেশভাগ'-এর পরিপ্রেক্ষিতে লেখা সব গল্পের মধ্যে স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রমী। এ গল্পে দেখা যায়, পূর্ণ গর্ভবতী হিন্দু মেয়ে পুষ্পিতা স্বামী আলি আহমেদের সঙ্গে রেলগাড়িতে করে পাকিস্তান পালায়। কারণ স্বামীর সাথে পাকিস্তানে পৌঁছে সে তার ভাবী সন্তানের জন্ম দেবে। সে হিন্দু নারী। কিন্তু তার একমাত্র ভালোবাসার মানুষ, তার স্বামী মুসলমান। দাঙ্গার দিনে হিন্দু নারী হওয়া সত্ত্বেও সে বিধর্মী মুসলমান স্বামীর হাত ধরেছে আর নতুন প্রজন্মকে সৃষ্টি করতে শত্রুর দেশেই রওয়ানা দিয়েছে। এই আশাবাদের প্রশংসার যেমন কোনো ভাষা হয় না, তেমনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বলতায় তা সকল উদাহরণকেই ছাপিয়ে যায়।

প্রতিথযশা কথাসাহিত্যিক অমর মিত্রের 'ধুলোগ্রাম'(২০১৫) উপন্যাসটিও দেশভাগের পটভূমিতে লেখা এক অসাধারণ উপন্যাস। এ উপন্যাসের শুভময়ের কৈশোর অথবা সৎ রামরতনের সেটেলমেন্ট অফিসারের চাকরীর মধ্যেও আছে আত্মানুসন্ধানের বীজ। এ উপন্যাসে 'আমতলি' সেই আদর্শ মন-নগর যেখানে বাসা বেঁধে থাকে স্বজন হারানো উদ্বাস্তু মানুষের দল যাঁরা মেনে নিতে পারে না রাষ্ট্রের কৌশলী বিভাজন বার্ত। পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সেটেলমেন্টে এমন অনেক 'আমতলী'-ই তৈরী করেছিলেন সেদিনের স্বদেশ ও স্বজন হারানো মানুষ। একইভাবে অমর মিত্রের লেখা 'নদীর ওপার', 'অন্ন-পরমান্ন', 'হোসেন মিঞার নাও', 'চোখ আর নদীর জল', 'সাঁকোবাড়ি', 'বনহংসীর দেশ', 'দেশের কথা গাঁয়ের কথা' ইত্যাদি গল্পে আছে দেশভাগ এর যন্ত্রণা, হতাশা, স্মৃতি আর আকাঙ্ক্ষার কথা। তাঁর 'দমবন্ধ' গল্পের প্রভাময়ীর মন পড়ে থাকে পুর্ববাংলায়। ট্রানজিস্টারে সে দেশের খবর শোনে। কখনও কখনও তার চেতনাকে আবিষ্ট করে ঘরের মধ্যে চলে আসে ছেড়ে আসা নদীর গন্ধ। হারানো দেশ আর হারানো মানুষের জন্য লেখকের নস্ট্যালজিক এই আকুতি হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

'দেশভাগ' নিয়ে কথাসাহিত্য রচনায় ইতিপূর্বে কম আলোচিত আর এক কথাসাহিত্যিক হলেন সুলেখা সান্যাল। তাঁর লেখা 'ফল্গু', 'জন্মাষ্টমী', 'গাজন-সন্ন্যাসী' প্রভৃতি গল্পগুলো দেশ বিভাগ নিয়ে রচিত। 'অন্তরায়' ও 'বিবর্তন'-এর বিষয়বস্তুও একই, নির্মম দেশবিভাগ ও উদ্বাস্তু জীবন। মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকা বাঙালির জীবনে এ ঘটনার অভিঘাত ছিল সুদূর প্রসারী। 'ফল্গু'তে দেখা যায় মহেশ্বরীকে যে কিনা অবিনাশের পিসিমা। কোলকাতা থেকে বেড়াতে আসা অবিনাশের স্ত্রী বরুণা যখন মহেশ্বরীর কাছে কোলকাতা চলে যাওয়ার প্রসঙ্গ তোলে তখন তার এক কথা-- 'ন' বছর বয়সে বিয়ে হয়ে এ পাড়া থেকে ও পাড়ায় গিয়েছিলাম - আর চৌদ্দ বছরে মেয়ে কোলে বিধবা হয়ে ফিরে এসেছিলাম এ বাড়িতে - এই আমার জীবনের জায়গা বদল। কোথায় যাব! এখানকার মাটি আঁকড়ে থাকবো শেষ দিন পর্যন্ত।' অসহায় বৃদ্ধার মর্মবিদারক এ অভিপ্রায় 'ফল্গু'কে সজীবতা দিয়েছে। অথচ এ পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে হিন্দু-মুসলমান নৈকট্যের ব্যাপারটিও লেখিকার দৃষ্টি এড়ায় নি। মতি যে মুসলমান তাই সে চৌধুরী বাড়িতে প্রবেশযোগ্য নয়। সেই মতিকে অনেকটা কাছাকাছি নিয়ে আসে বরুনা। বরুনা সকল জাতের মানুষদের নিয়ে পিকনিক করে, গল্প করে, একসাথে খায়। বরুনার সকল কর্মকাণ্ড বুড়ির কাছে উপস্থিত হয় 'জাত বিচার না - হিন্দু মুসলমান না, দেশ ভাগাভাগি না' এই গভীর সত্য নিয়ে। 'জন্মাষ্টমী' এবং 'গাজন-সন্ন্যাসী'র পশুপতি তেভাগার বিক্ষত সৈনিক। ফরিদপুরের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত এ গল্পের পশুপতি যখন জেলে যায় তখন তার বাবা কাশীনাথই পুত্রবধু ও নাতিকে নিয়ে হয়েছিল দেশান্তরী। দেশছাড়া ঘরছাড়া এ মানুষগুলো সম্পর্কে কাশীনাথের বিবরণ 'সাতজন মরিছে আমাশায়। জমি যেতি দেশে গরমেন্ট যে, সে তো জমি না পাথর। জল নাই এ দেশে, ফসল তুমি ফলাবা কেমন করে। একখান করে মাটির খুপরি, তারে দুই ভাগ করে দু'টো পরিবার থাকতি হবি।' এই যে নির্মমতা তাতেই এক সময় এসে হাজির হয় পশুপতি। সে আবার মানুষ খ্যাপাবে তার স্ত্রী মানদা এমন আশঙ্কা প্রকাশ করলে পশুপতির ক্ষুব্ধ ও মর্মন্তুদ উত্তর 'আদালত আমাগারে ছাড়েৎ দেছে কোন প্রমাণ না পায়ে, নিজের দ্যাশের থে শত্রুতা করে বার করে দেশে। তুইও কি তাড়ায়ে দিতি চাস আমারে'! বাস্তবতা এ গল্পের ঘটনার শিকড়ে শিকড়ে, যা ছেড়ে আসা দেশ-গাঁর মর্মযন্ত্রনাকে হৃদয়ে গ্রথিত করে দেয়।

একথা সত্য যে, এপার বাংলার লেখকদের তুলনায় ওপার বাংলার লেখকদের কথাসাহিত্যে দেশভাগের মর্মবেদনা প্রকৃত অর্থে প্রতিফলিত হয়েছিল অনেক বেশী। পূর্ববঙ্গে জন্ম নেওয়া নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, বুদ্ধদেব বসু বা সমরেশ বসুর মতো কথাসাহিত্যিকরা কলকাতার প্রেক্ষাপটে থেকে তাঁদের পরবর্তী জীবনে লেখা দেশভাগের গল্প-উপন্যাসে পূর্ববাংলায় ফেলে আসা সেই সোঁদা মাটির গন্ধ, সেই গৃহত্যাগের তীব্র বিষ-জ্বালা আর হতাশ্বাসের মর্মবিদারী হাহাকারকে হয়তো সেভাবে তুলে আনতে পারেন নি। সত্যিই হয়তো তাঁরা দেশভাগের প্রকৃতচিত্র, দ্বিজাতিতত্ত্বের ফলে সৃষ্ট বিভীষিকাময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের হঠকারিতা ইত্যাদিকে ভুলে হারানো শান্তি, সৌহার্দ্য, স্মৃতি আর নস্টালজিয়ার বর্ণনায় মজে ছিলেন। তবে সেইসঙ্গে একথাও সত্য যে, আজকের পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সাহিত্যে 'দেশভাগ' নিয়ে যত আকুলতা পূর্ববঙ্গীয় সাহিত্যে সে

আকুলতা আর ততোটা নেই। সে কি বাংলাদেশ নামক দেশটির পঁয়ত্রিশ বৎসরের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ফলেই? তবে এ সম্পর্কে এক অকাট্য সত্যের স্বীকৃতি আছে রফিকুল ইসলামের কথায়। তিনি বলেনঃ "যে বিপুল সংখ্যক বাঙালি হিন্দু পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে গেছে, তত বাঙালি মুসলমান উদ্বাস্তু হয়ে পূর্ববঙ্গে আসে নি—এসেছে অবাঙালি মুসলমান মোহাজের। ফলে দেশভাগজনিত মানবিক সমস্যাগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি সাহিত্যিকদের কাছে।" এ কথা বাস্তবিক সত্য বলেই মনে হয়।

ওপার বাংলার এক প্রথিতযশা লেখক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'লালসালু' ১৯৪৮ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। এ উপন্যাসেও লেখক বলতে চেয়েছেন এমন এক শ্রেণীর অর্ধশিক্ষিত লোকের কথা যারা ধর্মকে পুঁজি করে ব্যবসা করে। লক্ষণীয়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ দেশভাগের পর ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সহকারী বার্তা সম্পাদক ও পরে করাচি কেন্দ্রের বার্তা সম্পাদক হন। তাঁর 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' ছোটগল্পে দেশভাগ পরবর্তী ঢাকার সামাজিক সঙ্কট ও জীবনের যন্ত্রণা তিনি যেভাবে এঁকেছেন, সমকালে আমরা আর কোনো সাহিত্যে তেমনটি পাইনা। ওই গল্পে ভারতবর্ষে বামধারার ক্ষয়িষ্ণু রাজনীতির কথা বলতে গিয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ লিখেছেন : 'বামপন্থী মকসুদ আজ একা। তার সংশয়ের কাঁটাটি দুলতে দুলতে ডান দিকে এসে হেলে থেমে যায়।' এই যে ধর্মীয় জীবনবোধ ও রাজনীতিচেতনা, বাংলা সাহিত্যে তা বিরল।

ওপার বাংলার আর এক সার্থক কথাসাহিত্যিক হলেন হাসান আজিজুল হক। দেশভাগ ও দাঙ্গা বিষয়ক গল্প-উপন্যাসের ধারায় হাসান আজিজুল হকের গল্প-উপন্যাস স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। জন্ম তাঁর এপার বাংলার বর্ধমানে। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ, স্বাধীনতার পর ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ, পূর্ববাংলার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও উদ্বাস্তু সংকটের কালে হাসান আজিজুল হকের বয়স ছিল সামান্যই, কিন্তু প্রত্যেকটি ঘটনা তাঁর মনকে স্পর্শ করে গেছে। লেখকের মনকে যে জিজ্ঞাসা কুরে কুরে খেয়েছে তা হলো, বাংলার শ্রমিক, কৃষক, জেলে, তাঁতি, কামার, কুমোর বা যে কোনো সাধারণ মানুষ অসহ্য তালু জ্বালা ক্রোধে জিজ্ঞেস করতে পারে কেন দেশভাগ? জিন্নাহ্ সাহেবের মুসলিম লীগের জমিদার সামন্ত আয়মাদার আশরাফদের তা প্রয়োজন হতে পারে, প্যাটেল সাহেবদের জন্য হিন্দুরাজের প্রয়োজন হতে পারে, তার জন্যে পাঞ্জাব কাটা, বাংলা ভাঙাও হয়তো বা জরুরি হতে পারে—কিন্তু তার জন্য রাঢ়ের মুসলমান কেন যাবে পাকিস্তান, আর হাজার হাজার, লাখ লাখ হিন্দুই বা কেন ছেড়ে আসবে বাংলাদেশ? বিবেকতাড়িত অথচ উত্তরহীন এ প্রশ্ন কি হিন্দু-মুসলমান সহ আমাদের সকলেরই নয়! সেই বেদনাময় স্মৃতি তাঁর শিল্পীসত্তায় চিরজাগরূক। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'দেশভাগ আমার জীবনের জন্য একটি ক্ষতস্বরূপ। ক্ষত সারলেও দাগ থেকে যায়। আমি এই দাগের কারণ অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি।' বস্তুত, এই ব্যক্তিগত ক্ষতের কারণেই হয়তো হাসান আজিজুল হক বাস্তুচ্যুত মানুষের মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারেন, দেশভাগের প্রকৃত চিত্রকে করতে পারেন তাঁর কথাসাহিত্যের বিষয় ।

'দেশভাগ' সম্পর্কিত হাসান আজিজুলের অন্যতম উপন্যাসটির নাম হলো 'আগুনপাখি'। ২০০৬ সালে প্রকাশিত 'আগুনপাখি' উপন্যাসটি দেশবিভাগের পটভূমিতে এক নারীর বাস্তুর প্রতি মমত্ববোধের মানবিক আখ্যান। এক নারীর জবানিতে বর্ণনা করা উপন্যাসটিকে বলা হয়ে থাকে—এটি লেখকের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। এতে নস্টালজিয়ার উপস্থিতি প্রবল। উপন্যাসের ঘটনায় দেখি, গাঁয়ের একটি মেয়ে, বাপের বাড়ি আর শ্বশুরবাড়ির বাইরে সে জানে চারপাশের মানুষজনকে, যাদের মধ্যে বেশিরভাগই হিন্দু। হিন্দু বলে তারা যে আলাদা, তেমন কিছু বোঝেনা সে। গভীর মমতায় সে গড়ে তোলে তাদের বড় একান্নবর্তী সংসার, আর রাতের নিরালায় স্বামীর কাছে শিখে নেয় অল্পসল্প লেখাপড়া। সুখ-দুঃখ নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সে দেখে কেমন করে তার স্বামী জড়িয়ে পড়ে সামাজিক কাজে, হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের কাছেই কতটা প্রিয় নেতা হয়ে ওঠে সে। কিন্তু হঠাৎই যেন একদিন সবকিছু পাল্টে যায়। তাদের একান্নবর্তী সংসারেও ধরে ভাঙ্গন, আর বাইরে কোথা থেকে রব ওঠে যে দেশটাও নাকি ভাগ হয়ে যাবে। সে ভাবে তা কি করে হয় ? দেশ আবার ভাগ হয় কেমন করে ? অবিশ্বাস্য সেই ঘটনাও একদিন

সত্যি হলো। মুসলমান পরিজন আর পাড়া প্রতিবেশীরা চলে যেতে লাগলো ভিটে ছেড়ে। কিন্তু সে ? না, সে কিছুতেই যাবেনা, কেননা, সে বলে 'আমি আমাকে পাবার লেগেই এত কিছু ছেড়েছি। আমি জেদ করি নাই। কারুর কথার অবাধ্য হই নাই। আমি সবকিছু শুদু লিজে বুঝে নিতে চেয়েছি। আমাকে কেউ বোঝাইতে পারলে না ক্যানে আলেদা একটা দ্যাশ হয়েছে গোঁজামিল দিয়ে যিখানে শুধু মোসলমান থাকবে কিন্তুক হিঁদু কেরেস্তানও আবার থাকতে পারবে। তাইলে আলাদা কিসের? আমাকে কেউ বোঝাইতে পারলে না যে সেই দ্যাশটো আমি মোসলমান বলেই আমার দ্যাশ আর এই দ্যাশটা আমার লয়।' 'আগুনপাখি' উপন্যাসটা যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে দেখবো, পুরো উপন্যাসটা একজন নারীর আত্মকথন। সে দেশভাগ মানতে পারছে না। পরিবার ভাগ হয়ে যাচ্ছে এবং পরিবারকেও ছেড়ে দিচ্ছে সে। আর সে থেকে যাচ্ছে নিজের জায়গায়। ফিনিক্স পাখির মতো ওই ধ্বংসস্তুপে আবার বাঁচার চেষ্টা করছে এবং তার পরিবার চলে এলেও সে কিন্তু পশ্চিম বাংলা থেকে পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানে এল না। একজন অবুঝ নারী যে রাজনীতি বোঝে না, সাম্প্রদায়িকতা বোঝে না, শুধু বোঝে মমতায় ভরা দেশের মাটি, দেশের মানুষ—তার কাছে 'দেশভাগ' কি বেদনাবহ অর্থ নিয়ে উপস্থিত হয় 'আগুনপাখি' তারই সার্থক উদাহরণ। 'আগুনপাখি' উপন্যাসের কথক নারী, বাড়ির কর্তা, কর্ত্রী ও অন্যান্য সদস্যের কেউ হাসান আজিজুল হকের জীবনবৃত্তের বাইরের নন। বস্তুত, মানবভাগ্যের চরমতম বিপর্যয়ের ইতিহাস লিখতে গিয়ে তাঁর নিজের দিকেই, বিশেষ করে নিজের অস্তিত্বের শিকড়ের দিকেই তিনি তাকিয়েছেন। তাঁর পিতা-মাতার মধ্যে দেশত্যাগের যে মর্মান্তিক যন্ত্রণা ও রক্তক্ষরণ দেখেছেন, সেই যাতনার ইতিহাস-ই লিখেছেন তিনি এ উপন্যাসের নির্মাণ-আঙ্গিকে। তাঁর মা সাতাশি বছরের দীর্ঘজীবনের অধিকারী ছিলেন। শেষের দিকে তাঁর মায়ের স্মৃতিভ্রম ঘটেছিল এবং মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়েছিল। এই সময়ে তিনি অবচেতন মনে কথায় কথায় রাঢ়ের ঘরগেরস্থির প্রসঙ্গ টেনে আনতেন। উপন্যাসের কথক চরিত্রটিতে তিনি তাঁর মায়ের প্রতিমূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। হাসান আজিজুল হকের ক্ষুদ্রায়তনের উপন্যাস 'শিউলি'তে পশ্চিমবাংলার বর্ধমান থেকে পূর্ব বাংলার দিনাজপুরে স্থানান্তরিত একটি শিক্ষিত পরিবারের বৃত্তান্ত ঠাঁই পেয়েছে। দেশভাগ মানুষের মানবিক সম্পর্ক ও আকাঙ্ক্ষাকে কিভাবে আঘাত করে, বিনষ্ট করে, উপহার দেয় চিরজীবনের দীর্ঘশ্বাস, ছত্রিশ বছর বয়সী অবিবাহিতা শিউলির জীবন-বিন্যাসের মধ্যে তারই প্রতিফলন দেখা যায়।

হাসান আজিজুলের 'সমুদ্রের স্বপ্ন, শীতের অরণ্য' গ্রন্থের 'উত্তর বসন্তে' গল্পটির বিষয় এক পরিবারকে নিয়ে। এই পরিবারটি স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ফেলে প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় পাকিস্তানে দেশান্তরিত হয়। পরিবারের সদস্যরা আত্মীয়-পরিজনহীন নতুন পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে আপন করে নিতে পারে না। অর্থনৈতিক সংকটের কারণে সুস্থভাবে জীবনধারণের কোনো উপায় তারা খুঁজে পায় না। সন্তানাদি, অসুস্থ স্বামী, জঙ্গলের পরিত্যক্ত বাড়িকে ঘিরে বাড়ির কর্ত্রীর অশান্তির প্রলাপ ও অস্বস্তি প্রকাশের অন্তরালে শেকড়চ্যুতির কঠিন কষ্টের ও অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটে। দেশভাগ যে স্বপ্ন দেখিয়েছিল এই নারীকে, যে সুখ-স্বপ্নের মোহে ছেলের হাত ধরে জন্মভূমি ছেড়েছিল সে, সেখানে জায়গা করে নিয়েছে অসীম নৈরাশ্য, হতাশা, অপ্রাপ্তির দীর্ঘশ্বাস। বস্তুত, দেশভাগ তাদের উপহার দিয়েছে অবশ অবসাদ ও ভীষণ বীতশ্রদ্ধ একটি জীবন। জীর্ণ ন্যাকড়ার মতো অহরহ ওড়ে তাদের সে জীবন। তাদের পরিচিত বা প্রিয় বলে কেউ নেই। বেঁচে থাকার স্বপ্ন নেই। এমন কি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করা ছাড়া তাদের বেঁচে থাকার আর কোনো উপলক্ষ বা উদ্দেশ্যও নেই। পরিবারের প্রত্যেকেই মানসিক বৈকল্য ও ভারসাম্য হারিয়ে মনোবিকারগ্রস্ত। অন্ধকার ঘরের নির্জনে দিন-রাত পড়ে থাকেন অসুস্থ রুগ্ন গৃহকর্তা। তার জীবনে দেশভাগ কি দুর্বিপাক উপহার দিয়েছে, মেয়ে বাণীর উচ্চারণেই তা স্পষ্ট হয়। সে বলেঃ 'কি দিন কি রাতে ওর একটাও জানালা খোলেন না আব্বা। দিনের বেলাতেও মশারির ভিতর হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে পাথরের মত বসে থাকেন আব্বা আর মাঝে মাঝে দাঁত খিঁচিয়ে চিৎকার করে ওঠেন কারণে অকারণে। আব্বাকে ভাবতে গেলেই তাকে আর আলোর জীব বলে মনে হয় না। অস্পষ্ট অন্ধকারে তাকে যেন জীবন্ত বলেই মনে হয় না।' রিফ্যুজি হয়ে অমর্যাদাশীল ও পরিত্যক্ত জীবনযাপনের চাপে বাড়ির কর্তা মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। নিজের অক্ষমতা নিয়ে অন্ধকার

ঘরে দিনরাত কাটান। এখানে জীবনের স্পন্দন আছে কিন্তু প্রাণ নেই। শারীরিকভাবে কেউ বেঁচে আছেন বটে, কিন্তু বেঁচে থাকার নিষ্ঠুর দায় পালন করা ছাড়া আর তার কিছুই করার নেই। মুসলমানের দেশ পাকিস্তানে এসে এমন মানবেতর জীবনের সম্মুখীন হবেন, এই কথা সেদিনের হিন্দু-মুসলমানের কোনো রাজনৈতিক নেতা এসে তাদের বলেনি। দেশভাগ করে তাদের দেশান্তরিত করার সকল ব্যবস্থা করেছে তাদের অমতে ও অজান্তে। তাই তাদের কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। কারণ, তারা জানে কেউ কিছুই শুনবে না। যা ঘটার তাই ঘটবে। সবকিছুকেই নিয়তি বলে মেনে নিতে হবে। জীবনের এই প্রান্তিক মুহূর্তে অভ্যস্ত জীবনের পরিবর্তন দুঃসাধ্য ও গ্লানিকর।

হাসান আজিজুল হকের 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' বাংলা সাহিত্যের সমস্ত দেশভাগের গল্পের মধ্যে বিশিষ্টতার দাবিদার। দেশত্যাগী মানুষের মর্মঘাতী যন্ত্রণার তীব্রতার সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটেছে এ গল্পে। একটি জাতির ভাঙনের ইতিহাস ও তার বেদনাবহ পরিণতিকে হাসান আজিজুল হক অসাধারণ দক্ষতায় মূর্ত করে এ গল্পে তুলে ধরেছেন। গল্পের কেশো-বুড়ো বিপন্নলাঞ্ছিত ভাগ্যাহত মানুষের প্রতীক। আর করবী গাছ হচ্ছে তার আত্মজার প্রতীক। আত্মজাও তার কাছে বিষবৃক্ষের বীজ। তার ভেতর-বাইরে মরণঘাতী নিষাদ। তার কথায়, 'দেশ ছেড়েছে যে তার ভেতর বাইরে নেই। সব এক হয়ে গেছে।' তাঁর 'একটি নির্জলা কথা' গল্পের নায়িকাও দেশভাগের সব হারানো এক নারী।

হাসান আজিজুলের 'পরবাসী' গল্পটি 'দেশভাগ'-এর প্রেক্ষাপটে লেখা এক অসাধারণ গল্প। এ গল্পের বশির ও ওয়াজদ্দির মতো নিরীহ সাধারণ মানুষেরা জাতিগত বিদ্বেষ ও দাঙ্গার শিকার হয়। এ গল্পে দেখি, দেশভাগের পরে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অবসান ঘটেনি। বরং, ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছে দেশময়। গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষেরা দেশভাগের রাজনীতি থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করে বলে তাদের কল্পনাতেও আসেনি যে, কলকাতার দাঙ্গা গ্রামে ছড়িয়ে পড়বে বা তাদের গৃহহীন করবে। দাঙ্গা গ্রামের দিকে আসছে বশিরের এই আশঙ্কাকে উড়িয়ে দিয়ে উত্তেজিত ওয়াজদ্দি বশিরকে বলে, 'তোর বাপ কটো? এ্যা—কটো বাপ? মা কটো? একটো তো? দ্যাশও তেমনি একটো? বুইলি?' মরতে মরতেও যে মানুষ দেশকে ভালোবেসে যায় এ গল্প তারই প্রমাণ। জন্মদাতার মতো মানুষের জন্মভূমিও একটি—এই চিরন্তন সত্যটি দেশনেতাদের চিন্তায় লালন করার কথা ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেই চিন্তা তারা করেনি ক্ষমতার অন্ধমোহে বা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার কারণে। সেই চিন্তা লালন করে গ্রামের দরিদ্র কৃষক ওয়াজদ্দি। তার উক্তির মধ্য দিয়ে সে দেশভাগকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। দেশের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী এই মানুষটিকেই প্রথম খুন করে হিন্দু দাঙ্গাবাজরা। সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অসম্পর্কিত মানুষেরা কপালে সিঁদুর পরে অপ্রতিরোধ্য বেগে ছুটে আসে। গ্রামে আগুন ধরিয়ে আদিম প্রাগৈতিহাসিক তাণ্ডবলীলা চালায় এবং নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে। এই আকস্মিক আক্রমণে পুড়ে ছাই হয়ে যায় বশিরের ঘর-বাড়ি, ঘরের ভেতরের দুইজন মানুষ। গল্পকারের কথায়--বাড়িটা ততক্ষণে পুড়ে শেষ। ওরা চলে গেল। বল্লম দিয়ে মাটির সঙ্গে গাঁথা বশিরের সাত বছরের ছেলেটা। ছাব্বিশ বছরের একটি নারীদেহ কালো একখণ্ড পোড়া কাঠের মত পড়ে আছে ভাঙা দগ্ধ ঘরে। কাঁচা মাংস-পোড়ার উৎকট গন্ধে বাতাস ভারি। আর তারপর-- 'আল্লা তু যি থাকিস মানুষের দ্যাহোটার মধ্যি'- বুকফাটা চিৎকার করে উঠল বশির, 'কোতা, কোতা থাকিস তু, কুনখানে থাকিস বল।' এভাবেই জাতিগত বিদ্বেষের শিকার হয় ওয়াজদ্দির মতো নিখাদ দেশপ্রেমী, বশিরের মতো সাধারণ কৃষক, বশিরের স্ত্রী-সন্তানের মতো নিরীহ অসহায় নারী ও শিশু। এই ঘটনার পরে ফেরারী বশির আশ্রয় নেয় পাকিস্তানের সীমান্তে। তার মৃত্যুচিহ্নিত দু'চোখে ওয়াজদ্দির তাজা রক্ত, বল্লম দিয়ে গাঁথা ছেলের লাশ, আগুনে দগ্ধ স্ত্রীর লাশের জীবন্ত ছবি। এই চোখ হঠাৎ আবিষ্কার করে খালের পুবদিকের উঁচু জায়গায় ধুতি পরিহিত এক হিন্দু পাকিস্তান থেকে ভারতে প্রবেশের জন্য দাঁড়িয়েছে। সম্ভবত, পাকিস্তানে দাঙ্গায় বশিরের মতোই স্ত্রী-সন্তান হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে মানুষটি ভারতে পালাতে যাচ্ছে। বশিরের ভেতরে জিঘাংসা জেগে ওঠে। পোড়া স্ত্রী, বল্লম গাঁথা পুত্রের উষ্ণ রক্তের ছটা, মৃত ওয়াজদ্দির তীব্র চাহনি বশিরের মগজে আলোড়িত হতে থাকলে তার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। সে নৃশংসভাবে হত্যা করে সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষটিকে। নিম্নশ্রেণির হওয়ায় তার ভেতরের যন্ত্রণা, ক্রোধ ও প্রতিশোধের নেশাকে

কোনো ধরনের আবরণ পায়না। সম্পূর্ণ অচেনা ও অসহায় একজন মানুষকে প্রাগৈতিহাসিক বর্বরতা নিয়ে পশুর মতো হত্যা করে সে। কিন্তু হত্যার পরে মৃত মানুষটির মুখে ওয়াজদ্দির মুখচ্ছবি ভেসে উঠলে তার এই সত্যোপলব্ধি ঘটে, যে রক্তপাত সে নিজে ঘটিয়েছে, আর যে রক্তপাতকে সে ছেড়ে এসেছে—এই দু'য়ের মধ্যে কোনো তফাত নেই। তফাত নেই যাকে খুন করেছে তার মুখ, আর ওয়াজদ্দির রক্তাক্ত মুখাবয়বে। তখনি বশিরের চোখে জল নেমে আসে, যা তাকে দাঙ্গাপূর্ব নিরীহ বশিরে রূপান্তরিত করে। এ গল্পে রক্তপাত ও জাতি বিদ্বেষের বিরুদ্ধে অসাধারণ এক মানবিক আবেদন তৈরি হয়।

হাসান আজিজুল হকের 'জীবন ঘষে আগুন' গ্রন্থের 'খাঁচা' গল্পের অম্বুজাক্ষ বাস্তুভিটা ছেড়ে যাবার চাপা কষ্টকে আড়াল করে সেতারে করুণ সুর বাজিয়ে। এরইমধ্যে সাপের কামড়ে অম্বুজাক্ষের ছেলে অরুণের মৃত্যু হয়। বাস্তুভিটা ছেড়ে যেতে অনিচ্ছুক পিতা কালীপ্রসন্ন বিনা কারণে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয় এবং ছেলের কাছে মর্মান্তিক আকুতি জানায়, 'আমাকে মেরে ফেল্ বাবা, তোর পায়ে পড়ি, তোর ভাল হবে—আমি আশীর্বাদ করব তোকে।' এ দুটি ঘটনায় অম্বুজাক্ষ দেশত্যাগ করার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে। যেই মুহূর্তে তার এই সিদ্ধান্ত সেই মুহূর্তে তৈরি হয় নতুন এক সংকট। স্ত্রী সরোজিনী উন্মাদের মতো সেতারটি ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলে। এমনকি অম্বুজাক্ষকে শারীরিকভাবে আঘাত করতে উদ্যত হয়। দেশত্যাগের মাধ্যমে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার সামান্য যে প্রত্যাশা বা স্বপ্ন জেগেছিল, তার অপমৃত্যু ঘটেছে বলে সরোজিনীর এই উন্মাদনা। সরোজিনীর আক্রমণের মুখে অম্বুজাক্ষের 'আমাকে নয়, আমি নই' চিৎকার যেন দেশভাগের ইতিহাসের প্রেক্ষাপট থেকে উঠে আসে। অম্বুজাক্ষর এই আর্তনাদ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ক্রোধ ও হতাশায় সরোজিনীর এই উন্মাদনা তার দায় অম্বুজাক্ষের নয়, তা দেশভাগের জন্য দায়ী স্বার্থান্ধ নেতাদের। তাঁর 'দিবাস্বপ্ন' গল্পের করিম বখশ তার দীর্ঘজীবনের শেষে দেশত্যাগ করে। তখন তার দৃষ্টিশক্তি ফুরিয়ে এসেছে। কিন্তু তার মনশ্চক্ষু জেগে থাকে বাস্তুভিটায়। শীতের কাপড় ও মাথায় পশমি টুপি পরে সে অপেক্ষা করে সেই স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করার জন্যে। এই স্বপ্নরাজ্য তার বাস্তুভিটা, ছেড়ে আসা জন্মভূমির মাঠ-ঘাট, কৃষিক্ষেত, শস্যক্ষেত আর নানা গাছগাছালি। স্বপ্নে সে ফিরে যায় বাল্যকালে, যে বাল্যকাল তার দেশের মতোই সমান দূরে অবস্থিত। গল্পটি নস্ট্যালজিক।

হাসান আজিজুলের 'বিধবাদের কথা ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থের 'একটি নির্জল কথা' গল্পের দেশান্তরিত মা দেশভাগকে প্রত্যাখ্যান করেন, কিন্তু দেশ ছাড়ার নিয়তিকে তিনি এড়াতে পারেননি। সেই মার কথায়ঃ 'ছেলেদের কাছে শুদোই ক্যানে আমাকে ই ভিন্ দ্যাশে লিয়ে আনলি। ই দ্যাশ ই দ্যাশের লোকদের লেগে ভালো—আমাকে ক্যানে লিয়ে এলি! কুন দোজখিরা দ্যাশ ভেঙেছে, তাতে আমার কি? ... আমার মাটিটো ক্যানে কেড়ে লিবি? আমার পুকুর ঘাটটো, মাঠটো, বাগান টো ক্যানে লিবি? আমার চাঁদ-সুরুজ ক্যানে লোকে কেড়ে লেবে?' বস্তুত, এ জিজ্ঞাসা যেন দেশান্তরিত প্রত্যেক মানুষেরই জিজ্ঞাসা। কেন দেশভাগ আর কেন তাকে দেশ ছাড়তে হয়েছে, এই জিজ্ঞাসার সদুত্তর কেউ দেয়নি। যে দেশ ও বন্ধু-প্রতিবেশীকে সে ছেড়ে যাচ্ছে তাকে শত্রু বা পর ভাবার, অথবা যে দেশে সে যাচ্ছে সে দেশকে বা সে দেশের মানুষদের বন্ধু বা আপন ভাবার কোনো কারণ তাঁরা খুঁজে পায়নি।

ওপারবাংলার প্রথিতযশা কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা'তে দেশভাগের আর এক অন্য অনুভূতি ব্যক্ত হয়। 'খোয়াবনামা'-র সঙ্গে হাসান আজিজুলের 'আগুনপাখি' উপন্যাসের একটা তুলনামূলক দ্বৈততাও অনেকে খুঁজে পান। একটাসময় দেশভাগ, স্বাধীনতা এবং আধুনিকতার প্রবেশ: এই তিনের মধ্যে একদল কথাসাহিত্যিক ব্যস্ত ছিলেন দেশভাগের বেদনাবিধূরতা নিয়ে, আরেকদল সদ্যলব্ধ স্বাধীনতা ও আধুনিকতার ব্যবহারকে সন্দেহের চোখে দেখেছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেনে নিচ্ছেন ইতিহাসের অনিবার্যতাকে। কিন্তু 'খোয়াবনামা'-য় 'দেশভাগ' নিয়ে কোনো মায়াকান্না নেই। পূর্ববাংলার অবস্থান থেকে দেখা এই 'দেশভাগ' ও তৎজনিত কান্নার জন্ম একটা আদর্শবাদী রাজনৈতিক স্তরের ভেতর থেকে উঠে আসে। পূর্ব বাংলার কৃষকের জীবনে পাকিস্তানপ্রাপ্তি ছিল একটা মুক্তির প্রশ্ন। এই মুক্তির প্রতারণাটাই আসলে 'খোয়াবনামা'-র কাহিনী। সেখানে পাকিস্তান

হচ্ছে সেই স্বপ্নপূরণ, যেটা পেলে হয়তো সব কিছুই পাওয়া হয়ে যায়। অথচ যেদিনই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সেদিনই 'খোয়াবনামা' হারিয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ স্বপ্নভঙ্গ হচ্ছে। এ উপন্যাসের এক চরিত্র ডাক্তার আমিরুদ্দীন আখন্দের বলেঃ "মোসলমান হলো হিন্দু জমিদারের প্রজা, হিন্দু উকিলের মক্কেল, হিন্দু মহাজনের খাতক, হিন্দু মাস্টারের স্টুডেন্ট, হিন্দু ডাক্তারের পেশেন্ট।" একইরকম ভাবনা প্রকাশ পায় গৌরকিশোর ঘোষের 'প্রতিবেশী' উপন্যাসের মনসুরের কথায়। এ থেকেই বোঝা যায়, সাম্প্রদায়িকতার বিষ সমাজে কতদূর প্রবেশ করেছিল। আবার 'খোয়াবনামা' উপন্যাসেরই একটি দৃশ্য আছে যেখানে দেখা যায়, পাকিস্তান যেদিন স্বাধীন হলো সেদিনই বিদ্যুতের উঁচু খুঁটিতে পাকিস্তানের সবুজ পতাকা লাগাতে গিয়ে পড়ে গিয়ে মারা যায় এক যুবক। সে পড়ে পতাকার ওপর, আর তার শরীরের রক্ত সেই পতাকার সবুজ জমিনের মাঝখানে একটা লাল ছোপ তৈরি করে। ইলিয়াস এভাবেই দেখেন ভবিষ্যতের সোনার বাংলার সম্ভাবনাকে। পরবর্তীতে সাহিত্যিক দেবেশ রায়ও স্বীকার করেছেন যে বাংলাদেশের সাহিত্য স্বতন্ত্র হচ্ছে। আর তাতে 'খোয়াবনামা'-র ইলিয়াসের একটা ভূমিকা রয়েছে।

কথাসাহিত্যের বর্তমান আলোচনায় এবারে শেষ যে উপন্যাসটি নিয়ে আলোচনা করবো তা হলো আবদুস সামাদ-এর 'দো গজ জমিন'। এটি সত্তরের দশকের 'দেশভাগ'- এর ওপর লেখা ওপার বাংলার আর এক বিখ্যাত উপন্যাস। এর আখ্যানের প্রথম অংশের নায়ক যদি হয় আখতার হোসেন, তা হলে দ্বিতীয় অংশ তাঁর পুত্র হামিদকে কেন্দ্র করে লেখা। তার বাবা আজ উপমন্ত্রী, কিন্তু তিনি সুপারিশ করতে রাজি না হওয়ায় বি.এ. পাস করেও হামিদের চাকরি হয় না। অভিমানে হামিদ জানায়, পাকিস্তানে চলে যাবে সে। বিবিসাহেবা সন্ত্রস্ত, 'আল্লার নামে পাকিস্তান শব্দটা মুখে আনবে না। আরে ভাই, তুমি জানো না, পাকিস্তানে আমি কত কিছু খুইয়েছি।' বাড়ির দাসীর ছেলে চামু, কলকাতাবাসী হয়ে দারুণ করিতকর্মা হয়েছে। সে 'ঘাড়ধাক্কা পাসপোর্টে' হামিদকে পাঠিয়ে দেয় পূর্ব পাকিস্তানে। বিবিসাহেবার সংসার ভেঙে উপমহাদেশের তিন ভাগে ছড়িয়ে পড়ে। চামুর বড় সম্বন্ধী বদরুল ইসলাম তাকে চাকরি জুটিয়ে দেয়, তার মেয়ে নাজিয়ার সঙ্গে পরে হামিদের বিয়েও হয়। এখানে চলে আসা বিহারিরা মনে করে বাঙালি মুসলমানেরা নামেই মুসলমানআচরণ হিন্দুদের মতো। মেরে মেরে এদের ইসলামি আচরণ -তাদের আচার , রাষ্ট্র শেখানো উচিত। এরাভাষা উর্দুকে ঘৃণা করে। পারলে এই নামে-মুসলমানেরা কোরানশরিফও বাংলায় পড়বে। বাঙালি বাড়ির জামাই হামিদ বাঙালিদের সমর্থনের বৃথা চেষ্টা করে। কিছু দিন পরে পূর্ব পাকিস্তানে নতুন উত্তেজনা দেখা দেয়। পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা বেশি হলেও এত দিন ক্ষমতা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে। এ বারের নির্বাচনে বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনা দেখা দিল। বিহারিরা বাঙালিদের আপন মনে করেনি। পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী পুর্ব বাংলায় নির্যাতন ও হত্যা শুরু করলে সেনাদের সাহায্য করে অনেক বিহারি। স্থায়ী বাসিন্দা আর শরণার্থীদের মধ্যে বিভেদ ভয়ানক সত্যের চেহারায় বেরিয়ে পড়ে। সৈন্যরা বাঙালিদের উপর যেমন গণহত্যা চালিয়ে যায়, তেমনই পাকিস্তান সমর্থক বিহারিদের উপর শুরু হয় মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ। মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়েও চামুমামার দক্ষতায় হামিদ সপরিবার সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আসতে পারে। বিহারি শরণার্থীদের জন্য ভারতবর্ষে কারও মনে স্নিগ্ধ ভাব নেই, তাদের সবাইকে মনে করা হয় পাকিস্তানের চর। হামিদ বিহারশরিফে এলে দাদিমা বিবিসাহেবা হারানো নাতিকে আলিঙ্গন করেন এবং জানতে চান মামাকে সে সঙ্গে আনেনি কেন। হামিদ জানায়, মামা থাকেন পশ্চিম পাকিস্তানে, আর সে এসেছে পূর্ব পাকিস্তান থেকে। বিবিসাহেবা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'কতগুলো পাকিস্তান হয়েছে?' তিনি পাকিস্তানকে গালি দেন, সে তাঁর ছেলেদের হরণ করেছে। পর মুহূর্তেই তিনি পাকিস্তানকে আশীর্বাদ করেন, সেখানেই তাঁর বড় ছেলে সরোয়ার মাটি নিয়েছে। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় বিবিসাহেবার অবস্থা পাগলের মতো হয়, কখনও তিনি ভারতের জয় চান, কখনও পাকিস্তানের। বিবিসাহেবার মেয়ে, হামিদের মা'র মৃত্যু হয়। মেয়ের মৃত্যুর খবর তাঁকে না জানানো হলেও বিবিসাহেবা তার অনুপস্থিতি টের পেয়ে যান। তিনি জানতে চান, 'তাকে পাকিস্তান নিয়ে চলে যায়নি তো?' তিনি হাতজোড় করে পাকিস্তানের উদ্দেশে বলেন, 'রে পাকিস্তান, এখন আমার পেছন ছাড়, আমি তোর কোনো ক্ষতি করিনি, কোন অপরাধে আমাকে শাস্তি দিচ্ছিস, পাকিস্তান, ও পাকিস্তান।' যুদ্ধ ও 'দেশভাগ' ছিনিয়ে নিয়েছে বিবিসাহেবার জীবনের

সবকিছু। তবু রাষ্ট্রের নিজের স্বার্থে রচিত এ মানবিক অন্যায়, এ বর্বরোচিত অবিচারের বিরুদ্ধে তার কিছু করার নেই। শুধু তার কেন আমাদের কারোরই কিছু করার নেই, করার থাকে না। শুধু চোখ মেলে সর্বনাশের তাণ্ডব দেখে যেতে হয়, কান পেতে শয়তানের আঘাতের জান্তব নিনাদ শুনে যেতে হয়। আপন রাষ্ট্রই তখন হয়ে ওঠে মনুষ্যত্বের সবচেয়ে বড় শত্রু। বিবিসাহেবার শেষের কথাগুলি এ উপন্যাসে একইসাথে এক বড় সত্য ও ততোধিক মর্মন্তুদ বলে মনে হয়।

সহায়ক তথ্যপঞ্জী

১. **পলাশি থেকে পার্টিশান (আধুনিক ভারতের ইতিহাস), শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ ২০১৩**

২. **মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা, ইতিহাস রচনা এবং এই সময়, মইনুল হাসান, রূপালি পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ, ২০১৬, কলকাতা**

৩. ভাঙ্গা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য, অশ্রুকুমার সিকদার, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫, কলকাতা

৪. বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি, স্বপন বসু, হর্ষ দত্ত (সম্পাদিত), পুস্তক বিপণি, ২০০০, কলকাতা

৫. **বাংলা** উপন্যাসে **দেশভাগ ও** দেশত্যাগ, তারক সরকার, অরুণা প্রকাশন, ২০০৯, কলকাতা

৬. পার্টিশন সাহিত্য দেশ-কাল-স্মৃতি, মননকুমার মন্ডল (সম্পাদনা), গাঙচিল, কলকাতা

৭. দেশভাগ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, শহিদুল ইসলাম, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ফেব্রুয়ারী ২০০৪, কলকাতা বইমেলা

৮. হারানো দেশ হারানো মানুষ, দেশভাগ, অমর মিত্র, সোপান, প্রথম প্রকাশ ২০১৬, কলকাতা

৯. দেশভাগ, স্মৃতি আর স্তব্ধতা, সম্পাদনা সেমন্তী ঘোষ, চতুর্থ মুদ্রণ, অগস্ট ২০১৬, কলকাতা

১০. দেশভাগ: বিভাজনের রক্তাক্ত পদচিহ্ন, ড. মাহফুজ পারভেজ, নভেম্বর ২০১৫

১১. The Prose of Otherness, Gyanendra Pandey, In Arnold D & Hardiman D (ed), Subaltern Studies, OUP,1994

১২. Train ro Pakistan, Khuswant Singh, Penguin Books

১৩. The Price of Partition, Rafiq Zakaria, Bharatia Vidya Bhaban, 1998, Kolkata

১৪. Book Review: Khuswants Singh's 'Train to Pakistan', India Today, 1 October 2014

১৫. The Footprints of Partition, Anam Zakaria, Harper Collins, India